আগষ্ট ১৯৮৯

কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান

প্রচ্ছদ নিবন্ধ : মাছের রোগ

লিখেছেন : দেবাশীষ কর

জ্ঞান ও আনন্দের আশ্চর্য সমীকরণ

শারদীয়

কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান

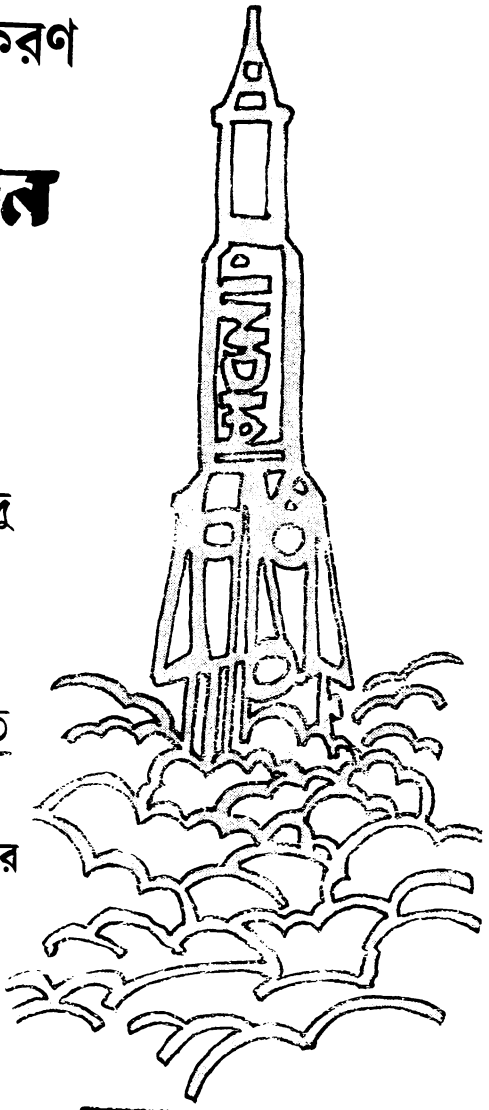

উপন্যাস ও গল্প লিখবেন

লীলা মজুমদার ॥ ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য ॥ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ॥ শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ॥ অদ্রীশ বর্ধন ॥ নিরঞ্জন সিংহ ॥ কিন্নর রায় ॥ সমরজিৎ কর ও অনেকে ।

বিশেষ প্রবন্ধগুচ্ছ : স্বাধীন ভারতে বিজ্ঞানের অগ্রগতি—লিখবেন

জগদীশচন্দ্র ভট্টাচার্য ॥ সূর্যেন্দু বিকাশ কর মহাপাত্র ॥ জয়ন্ত বসু ॥ রমাতোষ *সরকার ॥ বিমান বসু ॥ দিলীপকুমার* বন্দ্যোপাধ্যায় ও অনেকে

শ্রীপান্থ রচিত রোমাঞ্চকর প্রবন্ধ

ছড়া ও কবিতা লিখবেন

অন্নদাশঙ্কর রায় ॥ নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী ॥ কৃষ্ণ ধর ॥ অমিতাভ চৌধুরী ও অনেকে

সার্কিট ডায়াগ্রাম সহ

কম খরচের দশটি অভিনব মডেল

প্রস্তুতি শুরু হয়েছে বেরুবে পুজোর আগেই

পুজোর ছুটি ফুরিয়ে গেলেও যে বইয়ের প্রয়োজন ফুরোয় না

কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান

নবম বর্ষ 5ম সংখ্যা
আগস্ট 1989

সূচীপত্র

চিঠিপত্র : 4
কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর : নকল জীবমণ্ডল ॥ সমরজিৎ কর 7
প্রচ্ছদ নিবন্ধ : মাছের রোগ : দেবাশীষ কর 19 : মাছেদের অনুভূতি ॥ মানস কুণ্ডু 21 : বাঙ্গালীর মাছ ভাত ॥ কিন্নর রায় 22
পড়াশোনা : শব্দের কথা ॥ সমীরকুমার ঘোষ 15 : মজার সংখ্যা ॥ সুবীর চক্রবর্তী 16 : রেচন ॥ পুলিন বিহারী সাউ 18 : সহজ কথায় রসায়ন ॥ অমরনাথ রায় 51
বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প : মানব ও দানব ॥ সুব্রত মুখোপাধ্যায় 24
জীবজন্তু : ডাইনোসোর বিচিত্রা ॥ উদয়ন মুখার্জী 27
শরীর-স্বাস্থ্য-চিকিৎসা : দৃষ্টি বিভ্রম ॥ সৌমেন চ্যাটার্জী 39
ছড়া : ক্ষুদে শত্রু ভাইরাস ॥ দেবব্রত রায় 41
পৃথিবী ও পরিবেশ : বিদ্যুৎ ও বজ্রপাত ॥ শংকর পাল 49
নিজে নিজে কর : অডিও অ্যাম্প্লিফায়ার ॥ শ্যামাপদ পাণ্ডে 65 : সার্কিট ডায়াগ্রামের সাংকেতিক রূপ ॥ অনুপম দে 53 : মডেলের রকমফের ॥ নির্মলেন্দু বিকাশ পাত্র 54 : মডেল বানাতে গিয়ে ॥ রাজেশ গিরি 48
সায়েন্স এক্সপেরিমেণ্ট : রসায়নের ভেল্‌কি ॥ শুভ্রকান্তি নন্দ ও সৌম্যকান্তি নন্দ 64
ফিচার ও ছবিতে গল্প : আবিষ্কারক কলম্বাস ॥ গৌতম কর্মকার 12 : ফ্লাইং সোয়ার্ম ॥ সলিল রাহা 55 : ডাঁশ মৌমাছি ॥ ধীরেন দত্ত 56 : খুদে বৈজ্ঞানিক দিলীপ দাস 23 : উভচর মানব ॥ গৌতম কর্মকার ও অনিল কর্মকার 43
প্রতিযোগিতা : ক্যুইজ কনটেস্ট ॥ শব্দকূট ॥ শ্যামশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় 14 আই-কিউ টেস্ট 14 : অন্যান্য প্রতিযোগিতার সমাধান 14
আবিষ্কারের গল্প : কালি আবিষ্কারের কাহিনী ॥ রতনচন্দ্র ঘোষ 29
বিতর্ক : সমকোণী ত্রিভুজের বিশেষ ধর্ম ॥ সোমনাথ মুখার্জী 9
ধারাবাহিক রচনা : বোর্ণিওর বেরী ॥ সংকর্ষণ রায় 31
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি : স্ট্যাম্প প্যাডের কালি তৈরি ॥ প্রোটন কুমার 47
বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানী : ফিঙ্গার কমপিউটার ॥ গিরিশ রায় বর্মণ 66 : তুঁষ সুখময় মাজী 28 : সন্ন্যাসী বৈজ্ঞানিক ॥ সুব্রত দাস 30 : চব্বিশ ঘণ্টায় এক রাত্রি নয় কেন ॥ শ্যামল মজুমদার 40 : চাঁদের অভিকর্ষ ॥ তপন কুমার বিশ্বাস 42 : জেনে রাখা ভালো ॥ বিবেক রায় 42
কিশোর বিজ্ঞান পরিষদ : সফল উত্তরদাতাদের নাম 63 : বলতে পারো কেন ॥ সুধাংশু পাত্র 59
জ্ঞান বিজ্ঞানের বই 17 : বিজ্ঞান সংবাদ 66 : বিচিত্র সংবাদ 10 বিশ্ব বিজ্ঞান 6

আগামী সংখ্যায়

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

বিশ্বের বৃহত্তম জলজ উদ্ভিদ

লিখবেন

এণাক্ষী বিশ্বাস

প্রধান সম্পাদক : সমরজিৎ কর
সম্পাদক : রবীন বল
সহ সম্পাদক : জয়ন্ত দত্ত

কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞানের পক্ষে রবীন বল কর্তৃক 86/1, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-9 থেকে প্রকাশিত এবং চৌধুরী প্রিন্টিং ওয়ার্কস, P-21, সাহিত্য পরিষদ স্ট্রীট, কলকাতা-6 থেকে মুদ্রিত। দাম : 5.50 টাকা
প্রচ্ছদ : পুতুল ঘোষাল

বিজ্ঞান রচনায় আরও যত্নশীল হওয়া উচিৎ

গত জুন সংখ্যায় চিঠিপত্র বিভাগে বিভিন্ন চিঠিপত্রের পরিপ্রেক্ষিতে সুজিত কুমার পালের যে চিঠিটি ছাপা হয়েছে, তাতে তুলসী গাছের যে বৈজ্ঞানিক নাম দেওয়া হয়েছে তা সম্পূর্ণ ভুল। সাধারণ জ্ঞানের দ্বারাই তা বোঝা যায়। পত্রিকায় যে নাম প্রকাশ হয়েছে অর্থাৎ Ocimum Souctum Linn তার রয়েছে তিনটি অংশ কিন্তু আমরা এ যাবৎ যতগুলি বৈজ্ঞানিক নাম পেয়েছি তাদের প্রত্যেকের নামেরই আছে দুটি অংশ, অতএব তুলসী গাছের বৈজ্ঞানিক নাম Ocimum Sanctum হওয়াই যুক্তিযুক্ত তা ধারণা করা যায়। আর সুজিত বাবু ইংরাজীতে বৈজ্ঞানিক নামে তিনটি অংশ লিখলেও বাংলা নামে তা ঠিক লিখেছেন কিন্তু তিনি নিজেই জানেন না কোনটা ভুল। সুতরাং তাঁর এ ব্যাপারে আলোকপাত করা কি উচিৎ।

গত জুন সংখ্যায় আরও কিছু ভুল চোখে পড়ল। 39 পৃষ্ঠায় কিন্নর বাবু বাতাসের উপাদানের যে শতাংশ উল্লেখ করেছেন তা সম্পূর্ণ ভুল। পাঠক-পাঠিকা যাতে বিভ্রান্তিতে না পড়ে তার জন্য নীচে সঠিক তালিকাটি দেওয়া হল।

নাইট্রোজেন (N_2)	—78·084%
অক্সিজেন (O_2)	—20.946%
আর্গন (A)	— ·934%
কার্বন-ডাই-অক্সাইড (CO_2)	— ·033%
জলীয়বাষ্প (H_2O)	— ·00032%
নিওন (Ne)	— ·00182%
হিলিয়াম (He)	— ·00053%
ক্রিপটন (Kr)	— ·00012%
জেনন (Xe)	— ·00009%
হাইড্রোজেন (H_2)	— ·00005%
মিথেন (CH_4)	— ·00002%
ও নাইট্রাস আক্সাইড (N_2O)	— ·00005%
	মোট—100·00000%

অসীম বিশ্বাস, বগুলা, নদীয়া।

লেখকের উত্তর

জুন সংখ্যা কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানে প্রকাশিত আমার লেখা 'কলকাতার পরিবেশ' এর প্রসঙ্গে বায়ুস্তরে নাইট্রোজেন, অক্সিজেন এবং কার্বন-ডাই অক্সাইডের অনুপাত নিয়ে অসীমবাবু যে তথ্য দিয়েছেন তাও সর্বতো অর্থে সঠিক নয়। বিমান বসুর 'গ্রহ পরিচয় থেকে আমরা জানতে পারি, পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে নাইট্রোজেনের পরিমাণ 78·08%, অক্সিজেন 20·98% কার্বন-ডাই-অক্সাইড 0·03%। যে কোনো বৈজ্ঞানিক তথ্য নিঃসন্দেহে নির্ভুল দেয়া নিশ্চয়ই লেখকের কর্তব্য, তবে সামান্য হেরফেরের ব্যাপারটা তো প্রায় প্রচলিত তর্কযুদ্ধের স্তরে চলে যাচ্ছে। আর এ ধরণের হিসেব তো সব সময় বদলায়।

কিন্নর রায়, কলিকাতা-26

স্বাস্থ্য, খেলাধূলা ও বিজ্ঞান

গত ফেব্রুয়ারী হতে আমি বা আমরা কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞানের নিয়মিত গ্রাহক, পাঠক ও প্রচারক।

যাই হোক কিশোর 'জ্ঞান বিজ্ঞানের' গ্রাহক হওয়া সত্ত্বেও খেলাধূলা, ব্যায়াম বা সুস্বাস্থ্যের জন্য আমাদের অন্য কোন পত্রিকা নিতে হয় অথচ খেলাধূলা স্বাস্থ্য ও বিজ্ঞান পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। তাই **আমাদের প্রস্তাব : স্বাস্থ্য-খেলাধূলা ও বিজ্ঞান নিয়ে একটি বিভাগ খোলা,** এতে করে আমাদের খরচ কমবে।

রবিন হাজরা, সারদা প্রসাদ হাজরা ও উত্তম কুমার হাজরা, কামরা, কুসুমগ্রাম, বর্ধমান।

সম্পাদকের উত্তর

স্বাস্থ্য-খেলাধূলা ও বিজ্ঞান বিষয়ক একটি বিভাগ খোলার ইচ্ছে আমাদের অনেক দিন থেকেই। আমাদের পত্রিকায় নিছক খেলার বিবরণ তো ছাপা সম্ভব নয়। প্রয়োজনীয় ও উপযুক্ত লেখা পাচ্ছি না, তাই উক্ত বিভাগটি খোলা সম্ভব হচ্ছে না। —সম্পাদক

তারা মাছ

জুন, '89 সংখ্যায় শৈবাল কুমার গুহের তারা মাছ প্রবন্ধটিতে দেখলাম যে তারামাছের বিজ্ঞান সম্মত নাম উল্লেখ নেই। এই ধরনের প্রবন্ধ আমরা আরও পাব আশা করছি। এতে লেখক যদিও তারা মাছের অপকারিতা বা উপকারিতা উল্লেখ করেন নি। তিনি যদি এই সম্বন্ধে আলোকপাত করেন তাহলে আমরা খুশি হব।

জাহাঙ্গীর মণ্ডল, কেওটারা, বিজলী বর্ধমান।

উদ্ভিদের চলন ও গমন

গত এপ্রিল 1989 সংখ্যায় দীপঙ্কর দত্তের চলন ও গমন শীর্ষক প্রশ্নোত্তরে কতকগুলি ভুল চোখে পড়ল। সেগুলি হল,—

(1) উনি বলেছেন,—(B) আবিষ্ট গমন বা ট্যাকটিক গমন তিন রকম। কিন্তু ওনার ঐ তিনটি ছাড়াও আরো কতকগুলি আবিষ্ট গমন আছে। যথা—(লিখিত (iii) এর পর থেকে) ঃ—(iv) হাইড্রোট্যাকটিক—জল দ্বারা প্রভাবিত আবিষ্ট গমন এবং (v) গ্যালভানোট্যাকটিক—বৈদ্যুতিক শক্তি প্রভাবিত আবিষ্ট গমন।

(2) প্রথম প্রশ্নের উত্তরে উনি লিখছেন—অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে সঞ্চালনের নামলেন। এর বদলে হওয়া উচিত—

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে সঞ্চালনের নাম চলন।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে চলন ও গমনের উদ্দেশ্য হিসাবে উনি লিখেছেন—(i) খাদ্য সংগ্রহ, (ii) আত্মরক্ষা। (iii) জনন। (iv) পরিমান। (v) পরিবর্তিত পরিবেশের সাথে অভিযোজন।

"পরিমান" বলতে উনি কি বোঝাতে চেয়েছেন তা যদি উনি জানান তাহলে খুব ভাল হয়। এটা কি মুদ্রণ প্রমাদ ?

মলয় কুমার মিত্র, ঘরগোহাল, হুগলী।

ডায়াবেটিস

জুলাই 1988-এর 'কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান'-এ প্রকাশিত শ্রী দেবব্রত রায়ের 'ডায়াবেটিস' প্রবন্ধটি পড়লাম। প্রবন্ধটিতে শ্রীরায় সরল এবং সংক্ষিপ্ত ভাষায় ডায়বেটিস-এর শারীর বৃত্তীয় কারণগুলো আলোচনা করেছেন। এটি প্রশংসার দাবী রাখে। তবে প্রবন্ধটিতে কয়েকটি ভুল তথ্য পরিবেশিত হয়েছে।

(1) সূচনা করতে গিয়েই উনি জানিয়েছেন, খোঁজ করলে দেখা যাবে প্রায় প্রত্যেকটি পরিবারে কেউ না কেউ ডায়াবেটিসের রোগী।" তথ্যটি নিশ্চয়ই ওনার কল্পনা প্রসূত। আমাদের দেশে 2-5% মানুষ ডায়াবেটিসে ভোগেন; এঁদের মধ্যে অনেকেই অনির্ণীত (undiagnosed)। উন্নত দেশগুলিতে ডায়াবেটিস জনিত মৃত্যুর হার .01%—.02%। আর "ডায়াবেটিস কথাটির সঙ্গে পরিচিত নেই এই মুহূর্তে এমন মানুষের সংখ্যা" নিতান্ত নগন্য নয়।

(2) প্রবন্ধটিতে ইংরাজী বানান গুলো অনেক জায়গায় ভুল হয়েছে। এগুলি অবশ্য মুদ্রন প্রমাদ বলে মনে হয়।

(3) ডায়াবেটিসের যে লক্ষণগুলি শ্রীরায় দিয়েছেন, সেগুলি বিতর্ক সৃষ্টিকারী।

ডাঃ সুশান্ত কুমার পোদ্দার, সরকার পাড়া, গোবরডাঙ্গা, 24 পরগণা (উত্তর)।

মশা তাড়ানো যন্ত্র

কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান জুন সংখ্যায় প্রকাশিত চিঠিপত্র বিভাবে নির্মলেন্দু বিকাশ পাত্রের চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে জানাই যে, উনি ঠিকই ধরেছেন, মার্চএ প্রকাশিত মশা তাড়ানোর যন্ত্র নামক মডেলে Component List 2N2646 কে (Transitor) PNP বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ওটা সম্পূর্ণই অনিচ্ছা-কৃত ভুল। উনি ঠিকই বলেছেন Tnansistorটি Uni Junction Transistor হবে। আর press button switch সম্পর্কে বলি যে, সব মডেল পাঠকবর্গ বোধ হয় ঐ Switch সম্পর্কে জানেন। তাই বিশেষ ভাবে ঐ Switch এর কাজ কোথাও উল্লেখ করার প্রয়োজন মনে করা হয় নি। এ প্রসঙ্গে আরেকটু বলি, সার্কিট-এর নেগেটিভ ও পজেটিভ প্রায় বিপরীত হবে অর্থাৎ উপরের দিকটা পজেটিভ ও নীচের দিকটা নেগেটিভ। তাছাড়া আর একটু ভুল ওখানেই আছে যেটা হয়তো অনেকের চোখে পড়েনি সেটা হোল যেখানে (U J T) এর এর gate, ·01mf candenser এর সঙ্গে যুক্ত হয়নি। ওখানে ওটা যুক্ত হবে। ওখানে ফাঁকা রয়ে গেছে। এসব মুদ্রণ প্রমাদ ও অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য আমি আন্তরিক ভাবে দুঃখিত। আশা করি ভুলের সমাধান হওয়ায় সবাই খুশী হবেন।

শুভাশিস বিশ্বাস, বগুলা কলেজপাড়া, বগুলা, নদীয়া

জুন সংখ্যার পত্রিকায় "ড্রাগ ঃ আধুনিক সভ্যতার অভিশাপ" রচনাটির লেখক 'শান্তনু মিত্র'। মুদ্রণ প্রমাদ বশতঃ শান্তনু মিশ্র ছাপা হয়েছে। এজন্য আমরা দুঃখিত। —সাম্পাদক।

রোগ প্রতিরোধে মাইক্রো রোবোট

বাড়ীর লাইট, ফ্যান, মোটর প্রভৃতি খারাপ হয়ে গেলে বা ইলেকট্রিক লাইন ফল্ট্ হয়ে গেলে যেমন বাইরের ইলিকট্রিক মিস্ত্রিকে ডাকলে সে এসে তা সারিয়ে দিয়ে যায় তেমনি আমাদের শরীরের ভিতরের কোনো কোষ, কলা বা অঙ্গসমূহ রোগে ক্ষতিগ্রস্থ হলে মাইক্রো রোবোটকে শরীরের ভিতরে অনুপ্রবেশ করিয়ে দিলে তা সারিয়ে দেবে। না এটা কল্পনা নয়। বাস্তবের ডানায় ভর করে অচিরেই এর ব্যবহারিক প্রয়োগ মানব জীবনে সু-প্রযুক্ত হবে অন্তত জাপানী প্রযুক্তিবিদ্দের তাই ধারণা।

জাপানী প্রযুক্তিবিদ্রা এই ধরনের মাইক্রো রোবোট, তৈরি করতে চলেছেন এবং এ ব্যাপারে তাঁরা এক দীর্ঘ-মেয়াদী পরিকল্পনাও নিয়েছেন। আয়তনে এক মিলি-মিটারেরও কম হবে, এরা অনায়াসে ও স্বচ্ছন্দে শিরা, ধমনী বা অঙ্গ সমূহে বিচরণ করতে পারবে, এমন কি শিরা, ধমনী, কোষ বা কলার সঠিক ঘনত্ব পরিমাপ করতে পারবে। প্রযুক্তিবিদদের দৃঢ় অভিমত এই মাইক্রো রোবোটের জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র মোটর, গিয়ার, স্ক্রু প্রভৃতি যন্ত্রাংশ তাঁরা নিজেরাই তৈরী করতে পারবেন।

অতএব সেদিনের আর বেশি দেরী নেই যেদিন দেহের রোগ প্রতিরোধকারী বন্ধু হিসেবে মাইক্রো রোবোট দেহের ভিতর ঘুরে বেড়াবে এবং দেহকে রোগমুক্ত করতে সাহায্য করবে।

বাতানুকূল জুতো

জুতোর ভিতর অনেকক্ষণ পা থাকলে পায়ে অস্বস্তিকর দুর্গন্ধ হয়। বিশেষত বুট্ বা ঐ জাতীয় জুতোর ক্ষেত্রে, এই দুর্গন্ধের হাত থেকে 'পা'-কে রক্ষা করবার জন্য কয়েকজন পর্তুগীজ প্রযুক্তিবিদ্ এক সমাধান সূত্র বার করেছেন—'বাতানুকূল জুতো' (air conditioned shoe) আবিষ্কারের মাধ্যমে এই জুতোর ভিতরের দুর্গন্ধময় বাতাস বাইরের পরিবেশে নিষ্ক্রমনের জন্য এমন কতকগুলো ভাল্ব (valve) সমন্বিত ছিদ্র থাকবে যেগুলো স্বয়ংক্রিয় ভাবে (automatically) প্রতিটি পদক্ষেপের সঙ্গে খুলতে বা বন্ধ হতে পারবে। এর দরুণ পা দুর্গন্ধমুক্ত হবে।

[উৎস : The Statesman (17.2.89 এবং 8.4.89]

—মিঠু মাইতি

হৃদ্‌রোগ প্রতিরোধ করার বিরাট সম্ভাবনা

কোলেস্টেরল যে হৃদরোগের অন্যতম কারণ সে বিষয়ে বিজ্ঞানীরা অনেকদিন আগে থেকেই সন্দেহ পোষণ করে আসছিলেন। কোলেস্টেরল হলো একটি জৈব রাসায়নিক পদার্থ যেটি "ষ্টেরল" জাতীয় জৈব যৌগের শ্রেণীভুক্ত। এটি সাদা মোমের মতো একটি পদার্থ যা আমাদের শরীরের টিসুর মধ্যে থেকে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ ক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করে। কিন্তু কি করে এই স্নেহ জাতীয় পদার্থটি হৃদপিণ্ডের রক্ত বাহী নালীর দেয়ালে আটকে গিয়ে জমা হয়ে বিপত্তি ঘটায় অর্থাৎ বুকে ব্যাথা ও হৃদরোগের সৃষ্টি করে সে কথা বিজ্ঞানীরা এ পর্যন্ত জানতেন না।

সম্প্রতি আমেরিকার দু'জন নোবেল বিজয়ী বিজ্ঞানী এ বিষয়ে একটি নতুন তথ্য উদঘাটন করেছেন। তাঁরা গবেষণা করে দেখেছেন যে রক্তবাহী কোষের গায়ে আটকে যাওয়ার আগে অক্সিজেনের সাথে কোলেস্টেরলের রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে। বিজ্ঞানের ভাষায় যাকে বলা হয় 'অক্সিডেশন' বা জারণ। অর্থাৎ কোলেস্টেরল অক্সিডাইজড বা জারিত হওয়াটা তার ধমনীর গায়ে আটকে যাওয়ার একটি পূর্বশর্ত। তাঁদের তথ্য অনুযায়ী কোলেস্টেরল ধমনীর দেয়ালে আসার পর জারিত হয় এবং পরে রক্তের এক ধরণের শ্বেত কণিকাকে আকর্ষণ করে। এজন্য এই শ্বেত কণিকাগুলি জমাট বেঁধে জারিত কোলেস্টেরলকে আটকে ধরে এবং সুতোর মতো এক ধরণের স্নেহজাতীয় পদার্থের সৃষ্টি হয় যা হৃদরোগের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। শুধু তাই নয় কোলেস্টেরল সংযুক্ত জমাট বাঁধা এই সব শ্বেত কণিকা এক রকমের পদার্থ নিঃসৃত করে যা ধমনীর দেয়ালের ক্ষতি করে। কেননা, এই পদার্থটি ধমনীর কোষের সংখ্যা বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করে যায় ফলে ধমনী আরো সরল হয়ে যায় এবং রক্ত চলাচলে বিঘ্ন ঘটে। হৃদপিণ্ডকে তখন অধিক পরিশ্রম করতে হয় এই সব সরল ধমনীর ভেতর দিয়ে রক্ত পাম্প করার জন্য। ফলে অচিরে দেখা দেয় হৃদপিণ্ডে ব্যথা, বা হৃদরোগ। এই তথ্য জানার পর এখন তাই গবেষণা চলছে এমন একটি ওষুধ তৈরি করা যা কোলেস্টেরলের এই জারণ প্রক্রিয়াটিকে প্রতিরোধ করতে পারে। কেননা, কোলেস্টেরল যদি জারিত না হয় তবে ঐ সব শ্বেত কণিকাকে আর তা আকর্ষণ করতে পারবে না—ফলে ধমনীর গায়ে চর্বি জমার কাজটিও বন্ধ হয়—হৃদরোগের সম্ভাবনাও তাই থাকবে না। আশার কথা বিজ্ঞানীরা ইতি-মধ্যেই আবিষ্কার করেছেন এমন একটি ওষুধ যা প্রয়োগ করে খরগোশের মধ্যে হৃদরোগ দেখা দিচ্ছে বেশ কিছু দেরিতে।

সৌজন্য, আজকের বিজ্ঞান, বাংলাদেশ।

নকল জীবমণ্ডল

সমরজিৎ কর

আমেরিকা যুক্ত রাষ্ট্রের একটি প্রদেশ অ্যারিজোনা। তুসান তার একটি বড় শহর। অ্যারিজোনা মরুভূমির দেশ। তবে সে মরুভূমি আমাদের থর-এর মত নয়। থর মরুভূমি বালির সমুদ্র। অ্যারিজোনায় ঊষর ভূমি। সেখানে ক্যাকটাস এবং মোথা ঘাসের দঙ্গল। মাঝে মাঝে পাহাড়। তুসানেরও একটি দিক ঘিরে রেখেছে পাহাড়।

সেখানে যেতেই এক বিজ্ঞানী বললেন, জানেন, অ্যারিজোনার মরুভূমিতে কয়েক জন গবেষক একটি নকল জীবমণ্ডল তৈরি করেছে? তুসান থেকে বেশি দূরে নয়। মাত্র 60 কিলোমিটার দূরে অরেকুল জাংশন। তার কাছেই একটি খামার। সেখানেই তৈরি হচ্ছে ওই নকল জীবমণ্ডল।

মজার ব্যাপারই বটে। পৃথিবীর যে অঞ্চলটিতে প্রাণী এবং উদ্ভিদের বাস ইংরেজিতে তাকে বলা হয় 'বাইওস্ফিয়ার'। বাংলায় বলতে পার জীবমণ্ডল। পৃথিবীর সমস্ত স্থলভাগ, স্থলভাগের গভীরে কিছুটা অংশ এবং বায়ুমণ্ডলের অনেকটা নিয়েই এই জীবমণ্ডল বা 'বাইওস্ফিয়ার'। এর মধ্যে বাস করে নানা রকম ব্যাকটেরিয়া এবং জীবাণু, প্রাণী এবং উদ্ভিদ। এই অঞ্চলের পরিবেশ জীবজগতের পক্ষে অনুকূল বলে। পৃথিবীর নিজস্ব এই জীবমণ্ডলের নাম রেখেছেন বিজ্ঞানীরা বাইওস্ফিয়ার—1। আর অ্যারিজোনায় বিজ্ঞানীরা যে নকল জীবমণ্ডল তৈরি করেছেন তার নাম রাখা হয়েছে বাইওস্ফিয়ার-2। এটি তৈরি করতে সাহায্য করেছে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান—যেমন ওয়াশিংটন ডি.সি.-র স্মিথসোনিয়ান ইনস্টিটিউশন, হাওয়াই-এর বিশফ মিউজিয়াম, অ্যারিজোনা বিশ্ববিদ্যালয়, নিউইয়র্ক বোটানিক্যাল গার্ডেন, ব্রিটেনের কিউ গার্ডেন প্রভৃতি। এই জীবমণ্ডলে কোন্ কোন্ প্রাণী এবং উদ্ভিদ থাকবে সে সব ঠিক করেছেন তাঁরাই।

নকল জীবমণ্ডলটি তৈরি হয়েছে একটি বদ্ধ বাড়ির ভেতর। পুরো এক হেক্টর জমি জুড়ে বাড়ি। পুরোটারই ইস্পাতের তৈরি কাঠামো। কাচ দিয়ে ছাওয়া। ভেতরের আয়তন 200000 ঘন মিটার। বাইরের বাতাস না পারবে তার মধ্যে ঢুকতে, ভেতরের বাতাস না পারবে বাইরে বেরোতে। মানে পুরো বাড়িটাই একেবারে 'এয়ার টাইট'।

জায়গাটা মরুভূমির মধ্যে পড়ে বলে দিনের দিকে এখানে বেজায় গরম। রাতে ঠাণ্ডা। তাই বাড়িটি এমন ভাবে তৈরি হয়েছে যাতে দিনের দিকে অতিরিক্ত গরমে তার ভেতরের বাতাস যখন সম্প্রসারিত হবে, তখন বাড়িটিও হবে সম্প্রসারিত। আবার রাতের দিকে ঠাণ্ডার স্পর্শে ভেতরের বাতাস সঙ্কুচিত হলে বাড়িটি সঙ্কুচিত হবে।

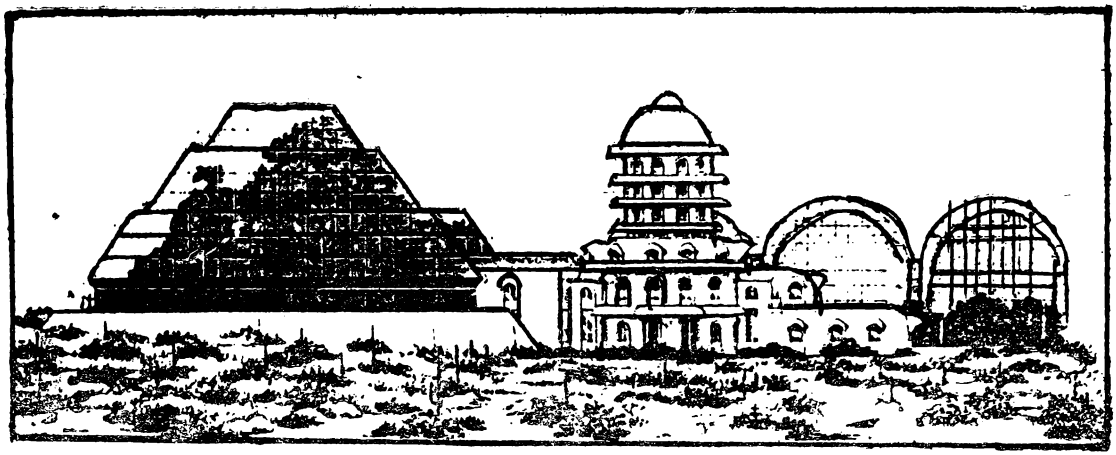

নকল জীবমণ্ডল তৈরির চেষ্টা হচ্ছে

বাড়িটি তৈরি হয়েছে একটি পাহাড়ের ঢালের উপর। তাই বিভিন্ন উচ্চতায় বাতাসের পরিচলনজনিত প্রবাহ হবে এক এক রকম। ভেতরে রয়েছে বড় বড় বৈদ্যুতিক পাখা। উষ্ণ বাতাস উঠবে উপরে। পৃথিবীতে যে ভাবে বাতাসের প্রবাহ ঘটে, ওই পাখাগুলি ঘরটির মধ্যেকার বাতাসেও ঘটাবে তেমন প্রবাহ। অর্থাৎ উন্মুক্ত পৃথিবীর মত ঘরটির মধ্যেও তৈরি হবে একটি নকল বায়ুমণ্ডল।

ভেতরে থাকছে খুদে সমুদ্র, হ্রদ, জলাভূমি। থাকছে উষ্ণ, নাতিশীতোষ্ণ এবং মেরু অঞ্চলের মত শীতল পরিবেশ। থাকছে নানা রকম পশুপাখি-কীটপতঙ্গ। বাড়িটির ভেতরে খাদ্য উৎপাদনের ব্যবস্থাও থাকছে। বপন করা হবে কিছু কিছু খাদ্য শস্য। সেই সব গাছপালায় বীজ উৎপাদনের জন্যে দরকার পরাগ সঞ্চার। তোমরা জান, এ কাজে সাহায্য করে নানা রকম কীট পতঙ্গ। মৌমাছিও তাদের মধ্যে পড়ে। কিন্তু মুশকিল হয়েছে এই, মৌমাছির সাহায্যে সেখানে পরাগ সঞ্চার সম্ভব হবে না। মৌমাছিদের পথ চলাচলের জন্যে দরকার অতিবেগুনী রশ্মি। পৃথিবীর পরিবেশে এই রশ্মি আসে সূর্য থেকে। কাচের ভেতর দিয়ে এই রশ্মি ঢুকতে বাধা পায়। তাই বাড়িটির মধ্যে অতি-বেগুনী রশ্মির অভাব হবে। ফলে মৌমাছিরা তার ভেতর ঠিকমত চলাচল করতে পারবে না। পারবে না পরাগ সঞ্চারে সাহায্য করতে। এই অসুবিধেটি দূর করতে সাহায্য নেওয়া হবে এক ধরণের পাখির—ইংরেজিতে যাদের বলা হয় হামিং বার্ডস (humming birds) বা গুঞ্জন পাখি। এরা আয়তনে হয় ছোট। দ্রুত পাখা কাঁপিয়ে সৃষ্টি করে গুঞ্জন। আমাদের খঞ্জনা পাখির মত। এক জোড়া পাখির জন্যে দৈনিক দরকার হবে 3200টি ফুলের মধুভাণ্ড। সেই মধু খেতে গিয়ে তাদের পা এবং ডানায় লাগবে রেণু। সেই রেণু সঞ্চারিত হবে বিভিন্ন ফুলের গর্ভমুণ্ডে।

বাড়িটির মধ্যে থাকছে রেইন ফরেস্ট। তার এক একটি গাছের উচ্চতা 25 মিটারের মত। সেই রেইন ফরেস্টের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হবে নকল নদী। নদীর জল গিয়ে পড়বে জলায়। জলা থেকে নকল সমুদ্রে। সমুদ্র থেকে জল বাষ্পে পরিণত হয়ে ফিরে আসবে রেইন ফরেস্টে। সৌর-শক্তি চালিত শীতক ব্যবস্থায় সেই বাষ্প ঘনীভূত হয়ে সৃষ্টি করবে বর্ষা এবং কুয়াশা। বর্ষার জল আবার ফিরে যাবে সমুদ্রে। আবার চলবে বর্ষা।

বাড়িটির মধ্যে গিয়ে যারা বাস করবে তাদের খাদ্যের জন্যে ফলেরও ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিশেষ করে সেই সব ফল যা গ্রীষ্মপ্রধান দেশে পাওয়া যায়। যেমন কলা। এ সব ফলের গাছও থাকছে সেখানে। সেই গাছেই জন্মাবে ফল। সেখানে যারা বাস করবে, খাদ্যের জন্যে খুদে সমুদ্র থেকে ধরবে মাছ। সেখানে 30টি মুর্গীও থাকছে ডিম যোগানর জন্যে। আর থাকছে তিনটি আফ্রিকার পিগমি ছাগল। যারা যোগাবে দুধ।

তবে বেশির ভাগ ফসলই উৎপাদন করতে হবে চাষবাস করে। ফলান হবে 140 রকম ফসল—ধান, গম, শাক-সব্জি মিলিয়ে। জৈবিক আবর্জনা থেকে তৈরি করা হবে সার। তিলাপিয়া মাছের দেহ থেকে নিঃসৃত বর্জ বস্তু থেকে উৎপাদন করা হবে অ্যামোনিয়া। সেই অ্যামোনিয়া থেকে নাইট্রেট এবং নাইট্রাইট সার। এই সার গাছগুলির জন্যে ব্যবহার করা হবে। জলীয় দ্রবণে থাকবে সার, সার থাকবে কুয়াশা বিন্দুর মধ্যে দ্রবীভূত। জলে হবে চাষবাস। জল এবং কুয়াশা থেকে গাছগুলি সংগ্রহ করবে সার।

গাছপালা যাতে কীট থেকে রক্ষা পায় তার কথাও ভাবা হয়েছে। তবে কীট ধ্বংস করার জন্যে ওই জীবমণ্ডলে কোন 'পেসটিসাইড' বা কীটনাশক রাসায়নিক বস্তু ব্যবহার করা হবে না। পরিবর্তে কাজে লাগান হবে ওই কীটগুলির খাদক হিসেবে কাজ করে এমন কিছু কিছু পোকা এবং পতঙ্গ। বিভিন্ন গবেষণার জন্যে সেখানে একটি পাঁচ তলা বাড়িও থাকছে। আগামী শরৎকালে সুরু হবে ফসল বোনার কাজ। জানুয়ারিতে জীবমণ্ডলের মধ্যে শেষ হবে প্রাকৃতিক পরিবেশ তৈরির কাজ। মুক্ত পৃথিবীর আবহাওয়ার মত সেখানেও আবহাওয়ায় অক্সিজেন কার্বন ডাই-অক্সাইড, প্রভৃতি গ্যাসের মাত্রা বজায় থাকবে।

এক কথায় এই নকল জীবমণ্ডলে গিয়ে যারা বাস করবে, তাদের বেঁচে থাকতে গেলে যা যা দরকার সবই বজায় থাকবে সেখানে। থাকবে শ্বাস-প্রশ্বাসের মত বাতাস, খাবার দরকার, জল—সব কিছু। বাইরে থেকে কিছুই সরবরাহ করা হবে না। সেই পরিবেশে যে সব বিষাক্ত গ্যাস তৈরি হবে, যেমন, সালফার ডাইঅক্সাইড, নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাডই, অ্যামোনিয়া, কার্বন মনোক্সাইড, ওজন, অ্যামোনিয়া, হাইড্রোজেন সালফাইড, ফরম্যালাডহাইড প্রভৃতি, তাদের মুক্ত করা হবে জীবাণুর সাহায্যে।

প্রাথমিক পরীক্ষার কাজ প্রায় শেষ। আগামী বছর, অর্থাৎ 1990 সালের সেপ্টেম্বরে নকল এই জীবমণ্ডলে প্রবেশ করবেন চার জন পুরুষ এবং পাঁচজন মহিলাবিজ্ঞানী। সেখানে তাঁরা বাস করবেন এক নাগাড়ে দুই বছর। ওই সময় বাইরের পরিবেশের সঙ্গে তাঁদের কোন সম্পর্কই থাকবে না। তাঁরা চাষবাস করে নিজেরাই উৎপাদন করবে তাঁদের খাদ্য। চালাবেন নানা রকম বৈজ্ঞানিক গবেষণা। নকল জীবমণ্ডলের বাড়িটি যদি ভেঙ্গে না পড়ে, অথবা কারোর যদি জরুরী চিকিৎসার দরকার না হয়, তা হলে তাঁরা এই দুটি বছর সেখানেই থাকবেন।

সমকোণী ত্রিভুজের একটি বিশেষ ধর্ম

সোমনাথ মুখার্জী

আমি দশম শ্রেণীর ছাত্র। সমকোণী ত্রিভুজ সংক্রান্ত একটি সমস্যা নিয়ে চিন্তা করার সময় হঠাৎ খেয়াল করলাম যে সককোণী ত্রিভুজের একটি নতুন ধর্ম রয়েছে যা আমাদের গণিত পাঠ্য পুস্তকে বা সমতুল্য কোন বইয়ে আমার নজরে পড়েনি। সেই সূত্রটি ও তার প্রমাণ এখানে দিচ্ছি।

ধর্ম—"সমকোণী ত্রিভুজে ভূমি এবং লম্ব ও অতিভূজ দ্বারা ধৃত কোণের Sine-এর অনুপাত, অতিভূজ এবং সমকোণের Sine-এর অনুপাত, লম্ব এবং ভূমি ও অতিভূজ দ্বারা ধৃত কোণের Sine-এর অনুপাত পরস্পর সমান।

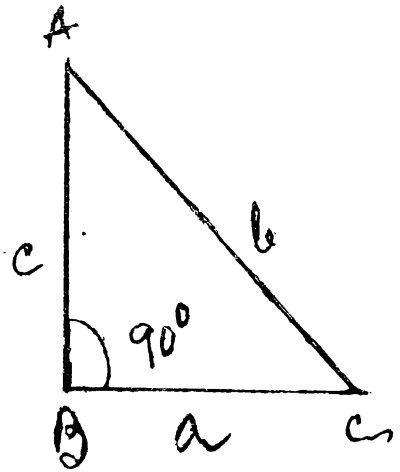

$\triangle ABC$ তে $\angle ABC = 90°$

$AC = b$, $BC = a$, $AB = C$ ধরি

AB হল ত্রিভুজটির লম্ব,

AC হল অতিভুজ, BC হল ভূমি।

প্রমাণ করতে হবে $\frac{a}{\text{Sin}\angle A} = \frac{b}{\text{Sin}\angle B} = \frac{c}{\text{Sin}\angle c}$

প্রমাণ ঃ $\text{Sin}\angle A = \frac{BC}{AC} = \frac{a}{b}$

$\therefore \frac{a}{\text{Sin}\angle A} = \frac{a}{\frac{a}{b}} = b$ .....(i)

$\text{Sin}\angle B = \text{Sin}\ 90° = 1$

$\therefore \frac{b}{\text{Sin}\angle B} = \frac{b}{\text{Sin}\ 90°} = \frac{b}{1} = b$ .....(ii)

এবং $\text{Sin}\angle C = \frac{AB}{AC} = \frac{c}{b}$

$\therefore \frac{C}{\text{Sin}\angle C} = \frac{c}{\frac{c}{b}} = b$ .....(iii)

(i), (ii), এবং (iii) নং সমীকরণ তিনটি তুলনা করে পাই,

$\frac{a}{\text{Sin}\angle A} = \frac{b}{\text{Sin}\angle B} = \frac{C}{\text{Sin}\angle C}$ [প্রমাণিত]

এই সমীকরণটি যদি কোন ছাত্রকে কোন অঙ্ক সমাধানে সাহায্য করে তাহলে খুশী হব। শুধু তাই নয়, এই নতুন ধর্মটি নিয়ে বিতর্কের পাতায় আলোচনা ও আহ্বান করছি।

বাঁধগোড়া, বোলপুর, বীরভূম।

বিতর্ক

বিতর্কের পাতা—কিশোর মনের বিচিত্র ভাবনা চিন্তার প্রতিফলন।

যুক্তিগ্রাহ্য যে কোন বিজ্ঞান রচনা 'বিতর্ক' বিভাগে

আলোচনার জন্য পাঠানো যেতে পারে।

বিচিত্র সংবাদ

বরুণ মজুমদার

হাতে সাতটা করে আঙুল

মানুষের একটা হাতে বা একটা পায়ে মোট পাঁচটা করে আঙুল থাকে—এইটাই স্বাভাবিক। কারো হাতের বুড়ো আঙুলের পাশে একটা ছোট্ট আঙুল বা কড়ে আঙুলের পাশে একটা ছোট্ট আঙুল থাকতে পারে, সেটা নেহাৎই একটা ব্যতিক্রম। কোনো জায়গায় যদি নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের হাতে বা পায়ে 7টা করে আঙুল থাকে, তবে তা নিশ্চয়ই আমাদের বিস্ময়ের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। এই বিস্ময়কর ঘটনার সাক্ষ্য বহন করে আছে স্পেনের একটা গ্রাম। নাম 'মোবা ভবা ডিবুই ট্রাজো'। মাদ্রিদ শহর থেকে বেশ কিছুটা দূরে অবস্থিত ঐ গ্রামে প্রত্যেক মানুষের তা তিনি পুরুষই হোন আর মহিলা হোন প্রতিটি হাতে ও প্রতিটি পায়ে আছে 7টা করে আঙুল। তাদের কাছে সেইটাই স্বাভাবিক। কোনো মানুষের হাতে বা পায়ে পাঁচটা করে আঙুল দেখলে তারা তাকে অস্বাভাবিক বলে ভাবে। তাই বাইরে থেকে কোনো মানুষ সেই গ্রামে বেড়াতে গেলে তার হাতে বা পায়ে পাঁচটা করে আঙুল দেখে তারা অবাক হয়ে যায়। অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখে সেই লোকটাকে। সত্যি পৃথিবীতে কত আশ্চর্য-ঘটনাই না ঘটে থাকে।

রোগ সারাতে হাসি

সুকুমার রায়ের সেই ছড়াটার কথা মনে আছে তো—'রামগরুড়ের ছানা, হাসতে তাদের মানা'। না, হাসতে মানা নয়, শুধু হাসতে হবে। দিন ভোর শুধু হেসে যান আর সুস্থ থাকুন। এতে অনেক রোগ সারবে। হাসিতে রোগ মুক্তির এই নতুন দাওয়াই-এর কথা বলেছেন সুইডেনের ডাক্তাররা। এই দাওয়াই-এর নাম 'হিউমার থেরাপি' বাংলা করলে দাঁড়ায় রসিকতা চিকিৎসা। ব্যাপারটা হয়ত একটু জটিল বলে মনে হচ্ছে। তার চেয়ে বরং আমরা বলি হাস্যৌষধি। যাঁরা বিভিন্ন জটিল রোগে ভুগছেন তাদের এই হিউমার থেরাপির মাধ্যমে সারিয়ে তোলা সম্ভব, অন্তত ডাক্তারদের এই অভিমত। তারা এভাবে সেদেশে 6 জন মহিলাকে সারিয়ে তুলেছেন। এই সব মহিলা শারীরিক যন্ত্রণায় অসহ্য কষ্ট পাচ্ছিলেন। পেশী, হাড় সর্বত্রই যন্ত্রণা। পরিহাস, হাসির বই, হাসির সিনেমা এসবের মাধ্যমে তাদের সময় কাটিয়ে দেহমন ভাল হয়ে গেছে। শুধু তাই নয়, শরীর থেকে রোগ যন্ত্রণা সব ম্যাজিকের মত উধাও; মন ভাল থাকলে অসুখ তাড়াতাড়ি সেরে যায়। তাই এই পদ্ধতিকে ডাক্তাররা কাজে লাগালেন।

বৃদ্ধ যুবক

কোনো বৃদ্ধ যদি যুবকের মত আচরণ করে তবে তার নয় একটা অর্থ হয়, কিন্তু যদি কোনো যুবককে বৃদ্ধের মত দেখা যায় তবে তাকে কি অকাল পক্ক বলা যায়? মাত্র ষোল বছরের কোনো যুবককে 160 বছরের বৃদ্ধের মত দেখাতে পারে কি? হয়ত ভাবছেন এটা গল্প কথা, শুনলে আশ্চর্য্য হবেন যে, 365 দিনে এক বছরের জায়গায় কোনো কোনো মানুষের বয়স বাড়ে দশ বছর করে। এরকম ভাবেই জোহানেশবার্গের ষোল বছর বয়স্ক ফ্রান্সিসয়ে জেরিংগারের বয়স এখন 160 বছর। এক অদ্ভুত রোগের শিকার এই যুবক। বিচিত্র এই রোগের নাম ইংরাজীতে Progeria।

যুবকের পিতা হেমমান জেরিংগার জানিয়েছেন যে, বয়স বৃদ্ধির এই রোগে আক্রান্ত ফ্রান্সিসের ষোড়শ জন্মদিনটি পালন করা হয়েছে 1988 সালের ডিসেম্বর মাসে। ডাক্তারী পরীক্ষায় তার বয়স এখন 160 বৎসর। ডাক্তাররা জানিয়েছেন যে তার হৃদ্‌পিণ্ড বয়স্ক লোকের মতই অনেক পুরানো ও অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছে। এই কারণে সিঁড়ি ভেঙ্গে উপরে উঠে ক্লাশ করা তার পক্ষে সম্ভব হবে না। তার আর স্কুলে যাওয়া হবে না—একথা শোনার পর সে পেনশনের জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদনপত্র পাঠিয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকা কর্তৃপক্ষ শীঘ্রই এই আবেদনের উত্তর দিচ্ছেন, পেনশনের টাকা পেলে ফ্রান্সিসয়ে কিছু গোল্ড ফিশ কিনবে। আর পৃথিবীতে এই অত্যন্ত অদ্ভুত রোগীর সংখ্যা এখন মাত্র 85।

কুইজ কনটেস্ট

গ্রেড I

আগস্ট '89 VII-VIII

1. ভারতে নির্মিত প্রথম সংকৃত ছায়াছবির নাম কি ?
2. 'Operation Blue Star বলতে ভারতীয় সামরিক বাহিনীতে কি বোঝায় ?
3. ভারতের প্রাচীনতম ফুলবল টুর্ন মেন্টের নাম কি ?
4. যিনি সর্বান্তঃকরণে কোরান শিক্ষা করেছেন তাঁকে কোন নামে অভিহিত করা হয় ?
5. মাছটির নাম কি ?

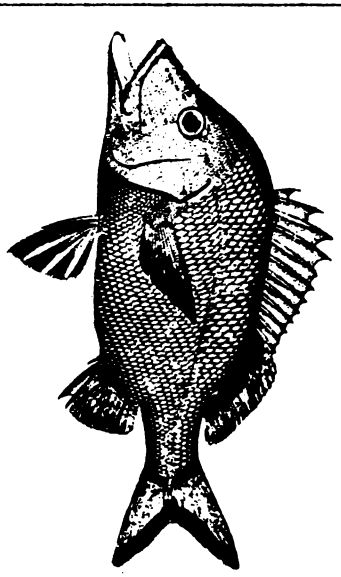

6 ফিরোমোন কি ?
7. পশ্চিমবঙ্গের কোথায় টিসু কাগজ উৎপন্ন হয় ?
8. এমন একটি এককোষী প্রাণীর নাম কর (বৈজ্ঞানিক) যা মানুষের অপকার করে ?
9. অন্নদা মুন্সী কিসের জন্য বিখ্যাত ?
10. 'ফেলুদা' চরিত্রের স্রষ্টা কে ?

গ্রেড II

আগস্ট '89 IX-X

1. 'হিন্দু ফিমেল স্কুল' স্থাপনে বেথুন সাহেবকে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন কে ?
2. নীচের ব্যক্তির পরিচয় কি ?

3. বিক্রমশীলা মহাবিহার কোথায় তৈরি হয়েছিল ?
4. E & O E কথাটির সম্পূর্ণ রূপ কি ?
5. বাংলার শেষ হিন্দুরাজ বংশ কোনটি ?
6. কোন বিজ্ঞানী প্রথম বলেছিলেন তাপ একপ্রকার শক্তি ?
7. নীলগিরির দক্ষিণের গিরিপথটির নাম কি ?
8. প্রাণীদেহে কোন কোষের বিভাজন হয় না ?
9. কোন বিজ্ঞানী 1983 সালের কলিঙ্গ পুরস্কার লাভ করেন ?
10. ভারতের রাষ্ট্রীয় পদার্থ বিজ্ঞান গবেষণাগার কোথায় অবস্থিত ?

গ্রেড III

আগস্ট '89 XI-XII

1 সোণা ও সোডিয়ামের মধ্যে কোনটি জলের চেয়ে হালকা ?
2. মাইক্রোস্কোপের প্রতিবিম্ব সদ্‌বিম্ব না আসদ্‌বিম্ব ?
3. কোন শ্রেণীর লিভারে সর্বদাই যান্ত্রিক সুবিধা পাওয়া যায় ?
4. ভারতে কোন নদীর উপরে মাইথন বাঁধ নির্মিত ?
5. 'শের ই পাঞ্জাব' নামে কে পরিচিত ছিলেন ?
6. 'দায়ভাগ' নামক আইন গ্রন্থের রচয়িতা কে ?
7. Rubic Cube-এর আবিষ্কর্তা Erno Rubic কোন দেশের নাগরিক ?
8. ক্যামাডার প্রথম ওলিম্পিক চ্যাম্পিয়ানের নাম কি ?
9. একদা 'Tycoon' উপাধি দেওয়া হয়েছিল কোন দেশের সেনাধ্যক্ষকে ?
10. নীচের ছবিটির পরিচয় বল ?

আবিষ্কারক কলম্বাস

বাণীরূপ : অনিল কর্মকার/চিত্রায়ণ : গৌতম কর্মকার

বাহামা দ্বীপাবলির এই মনোরম ভূলভাগটির নাম গুয়ানাহানি, যদিও কলম্বাসের তখনো ধারণা—তিনি পা রেখেছেন ভারতবর্ষের মাটিতে। তাই চারপাশে যখন বিস্ময়াহত দ্বীপবাসীর দল তাঁদের ঘিরে এলো, তাদের বলিষ্ঠ আকর্ষণীয় রূপ, তামাটে রঙ, তাদের সরল নিষ্পাপ দৃষ্টি, নাকের ডগায় ছোট ছোট সোনার নোলক—তাদের ভারতবাসী বলেই বিশ্বাস করে নিলেন কলম্বাস। মানুষের ইতিহাস গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁর বিশ্বাসকেই আজও অমর করে রেখেছে ঐ পরিচয়েই, 'রেড ইণ্ডিয়ান' নামেই আমেরিকার এই আদিম অধিবাসীরা আজও আখ্যাত।

দ্বীপবাসীদের কাছে তাঁদের আবির্ভাব আকাশের দেবতাদের মতো। সমুদ্রের বুক বেয়ে পালতোলা জাহাজে তাঁরা ভেসে এলেন দ্বীপের মাটিতে। সাদা চামড়ার আগন্তুকদের জন্যে তারা উপহারের পর উপহারের ডালি এনে সকলে মেতে গেল গভীর আনন্দে। কলম্বাস দিলেন রঙীন কাচের মাল্যদানা, ছোট ছোট অলঙ্কার, কাচের পাত্র। লাল পশমী টুপি, সুতোর বল—বিনিময়ে পেলেন অজস্র আহার্য এবং ছোট ছোট সোনার নোলক।

ভাষার অন্তরাল সীমাহীন। তবু আভাষে ইঙ্গিতে শান্ত সুশীল দ্বীপবাসীদের সঙ্গে আলোচনায় কলম্বাস উপলব্ধি করলেন—সান সালভাডোর থেকে দক্ষিণে এবং পশ্চিমে শুধু দ্বীপের পর দ্বীপের অধিষ্ঠান। তার মাঝখানে রয়েছে দক্ষিণের একটি দ্বীপ, দ্বীপের রাজা—সোনার সম্পদ যাঁর সীমাহীন।

সমসাময়িক যুগের মানচিত্রে এশিয়ার ভূখণ্ডকে বেষ্টন করে এমনি দ্বীপের পর দ্বীপ কলম্বাস দেখেছিলেন, যার মাঝখানে ছিল সুবিশাল এক দ্বীপ চিপাংগু—জাপান। অথৈ সোনার ভাণ্ডার। মার্কো পোলো লিখে গেছেন—সেই সোনার দ্বীপের প্রাসাদগুলি ছাদে আর মেঝেয় সোনা দিয়ে মোড়া। দেয়ালে দেয়ালে অজস্র সোনার অলঙ্করণ।

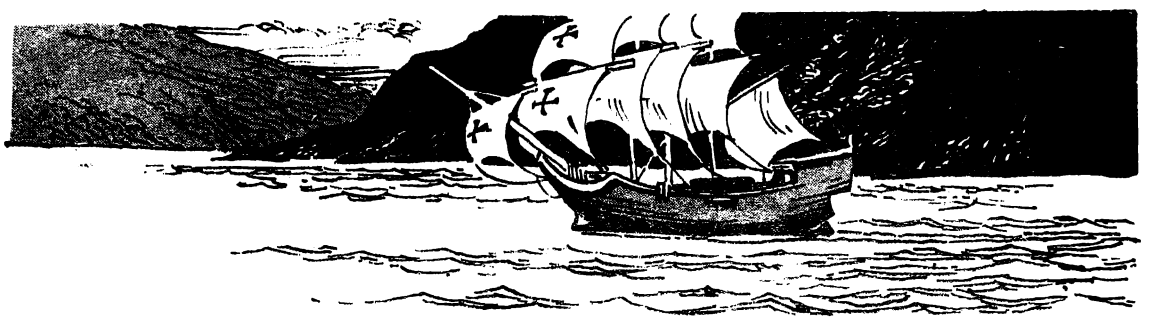

সান সালভাডোরে দুটো দিন কাটিয়ে কলম্বাস ভেসে চললেন দক্ষিণ পশ্চিমে। সঙ্গে ছ'জন দ্বীপবাসী চললো নব নব দ্বীপের সন্ধান তাঁকে দেবার জন্যে, সেখানকার মানুষদের কাছে তাঁদের পরিচিত করে দেবার কর্তব্যে। খবর ছুটে গেল দ্বীপ থেকে দ্বীপে, শ্বেতাঙ্গ দেবতাদের দল পৃথিবীতে নেমে এসেছেন।

পক্ষকাল ধরে অসীম উত্তেজনায় ভেসে চললেন কলম্বাস। দ্বীপের পর দ্বীপে কতো নতুন নতুন উদ্ভিদ, কতো আশ্চর্য প্রাণী। কী দুর্ভাগ্য! তাদের নাম কলম্বাস জানেন না। মিষ্টি আলুর মনোরম স্বাদ, পোড়া জনারের ভরাট তৃপ্তি, পাকা আনারসের আশ্চর্য সুগন্ধ—বিহ্বল হয়ে গেলেন কলম্বাস। এসবের কোনও সন্ধান তো মার্কো পোলো দেননি। এ কেমন পৃথিবী? দ্বীপে দ্বীপে কী বিচিত্র দোলনার বিছানা—মোটা সুতোয় জালের মতো করে বোনা, দুপাশের গাছের ডাল থেকে ঝোলানো—কেমন দোল খেতে খেতে আরামে নিদ্রায় ঢলে পড়া। আহ, আর কঠিন কাঠের পাটাতনের উপর নয়, এবার থেকে জলযাত্রায় এমনি দোলনার উপর স্বপ্ন দেখতে দেখতে তাঁরা ফিরে যাবেন স্বদেশের মাটিতে।

দ্বীপের পর দ্বীপ পার হয়ে কলম্বাস চলেছেন, কিন্তু কোথায় সোনা? সহযাত্রী দু'জন রেড ইণ্ডিয়ান বারবার বলে—আরও দক্ষিণে রয়েছে বিশাল এক দ্বীপ—কিউবা। তার তটভূমিতে অনেক অনেক জাহাজ। কলম্বাস ভাবলেন —এই তাহলে তাঁর স্বপ্নের দ্বীপ চিপাংগু।

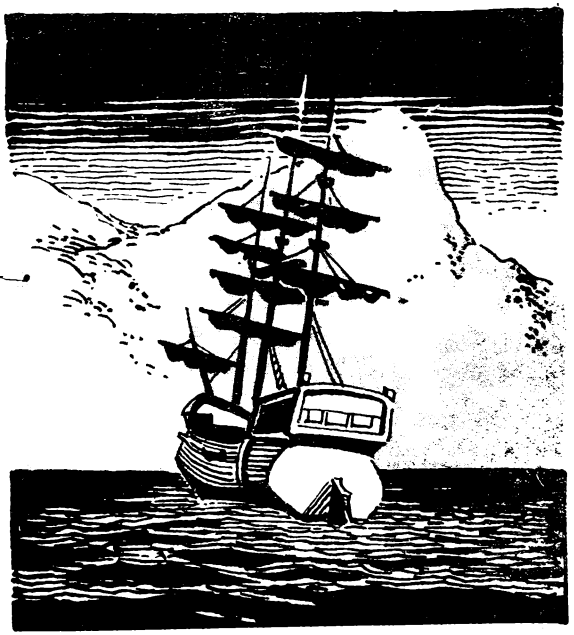

27 অক্টোবর সন্ধ্যায় যখন সূর্য প্রায় ডুবুডুবু, তখন দূরে তাঁরা কিউবার তটভূমি লক্ষ্য করলেন। নীল নীল উঁচু পাহাড় চলে গেছে পূর্ব থেকে পশ্চিমে—পাহাড়ের পর পাহাড়, মনোরম শৈলমালা দ্বীপভূমি বেষ্টন করে তাকে রক্ষা করে চলেছে সমুদ্রের রোষ থেকে।

কিউবার তটভূমিতে কলম্বাস নোঙর করলেন 28 অক্টোবর। জীবনে এমন অপরূপ দ্বীপ আর কখনো কলম্বাস দেখেননি। মনোরম পোতাশ্রয়, নৃত্যরত প্রবাহিনীদের গর্জমান সাগরসঙ্গম, চারপাশের ঘনসবুজ তরু-বীথিকায় বর্ণময় পাখির ঝাঁক, তাদের সুমধুর সঙ্গীত—কলম্বাসের জীবনস্বপ্ন আজ সার্থক।

কিন্তু কোথায় সেই মার্কো পোলোর মায়া-নগর? কলম্বাস দেখলেন বেলাভূমির উপর এখানে ওখানে ছড়িয়ে রয়েছে কতকগুলো ক্যানো। কাছেই একটা ছোট্ট গ্রাম—গোল গোল কুটির। সোনার পাতের বদলে তার ছাদ ঢেকেছে তাল-পাতার ছাউনী। কলম্বাস তাঁর সোনার নোলক হাতে করে আদিবাসীদের দেখালেন। এবার তারা নির্দেশ করলো দ্বীপের অভ্যন্তর ভাগ। সমস্বরে তারা উচ্চারণ করলো —কিউবানাকান।

কিউবানাকান—কান, খান? তবে কি এরা ইঙ্গিত করছে মহাধনবান খানেদের কথা? তিনি কি তবে চিপাংগুতে আদৌ আসেননি, এসে পৌঁছেছেন এশিয়ারই কোনও ভূখণ্ডে যার ঐশ্বর্য এখন ক্ষীয়মান। তবে কি চীনেরই কোনও অংশ?

[চলবে]

শব্দকূট

শ্যামশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়

পাশাপাশি ঃ

1. গণিতের একটি ভাগ যাহাতে কাঁটা কম্পাস ব্যবহার করা হয়। 2. কোনো বস্তুর নির্দিষ্ট দিকে স্থান পরিবর্তনকে যা বলা হয়। 3. মাছের গমন অঙ্গ 4. সি. জি. এস পদ্ধতিতে তরলের একক। 5. যার বিজ্ঞানসম্মত নাম "Borassus flubellifer. 6. যাহার বিজ্ঞানসম্মত নাম Solanum melogana.

উপর নিচ ঃ

2. সরল ফলের একটি ভাগ। 3. তরল ধাতু। 5. এম. কে. এস পদ্ধতিতে দৈর্ঘ্যের একক। 7. পদার্থের একটি ভাগ। 8. যাহার বিজ্ঞান সম্মত নাম Oryza Sativa. 9. যে গাছের বিজ্ঞানসম্মত নাম Shorea robusta। 10. শামুকের গমনাঙ্গ।

প্রযত্নে—চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, পাটুলী, কালীতলা বর্ধমান।

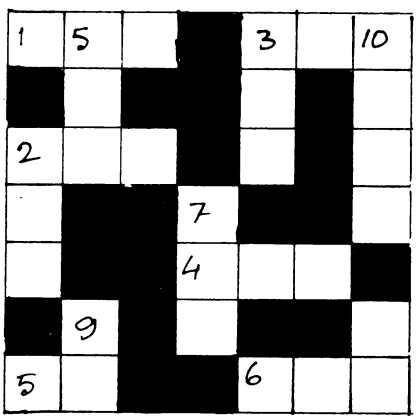

আই কিউ টেস্ট / আগস্ট 1989

1. হারিয়ে যাওয়া সংখ্যাটি কত—

6	10	14
12	?	22
19	25	31

2. সেলসিয়াস স্কেলে তাপমাত্রার পাঠ 30° হলে ফারেনহাইট স্কেলে তার পাঠ হবে—

(a) 60°, (b) 55°, (c) 86°, (d) 30°

3. ফ্লোরোকার্বনের অপর নাম কি—

(a) ডেক্রন, (b) টেফলন, (c) নাইলন।

4. চোখের কোণের শুভ্র ঝিল্লী লুপ্তপ্রায় অঙ্গ হিসেবে দেখা যায়—

(a) পাখির ক্ষেত্রে, (b) মানুষের ক্ষেত্রে।

5. সেলেনিয়াম ধাতুর ওপর আলো ফেলা হলো।— এক্ষেত্রে ধাতুটির রোধ বাড়বে, না কমবে ?

ক্যুইজ কনটেস্ট সমাধান

জুন '89 VII-VIII গ্রেড-I

1. পণ্ডিচেরীতে। 2. এশিয়ার হুনদের এক রাজা। 3. হাফিজ। 4. ইটালীতে। 5. কুন্দনলাল সায়গল। 6. আমেরিকার বিদায়ী রাষ্ট্রপতি 'রোনাল্ড রেগন'। 7. প্রচণ্ড বিস্ফোরক রাসায়নিক পদার্থ। 8. টাইটান। 9. আটটি। 10. মহর্ষি বেদব্যাস।

জুন '89 IX-X গ্রেড-II

1. 12 সমকোণ। 2. $NaHSO_4$। 3. অ্যালবুমিন। 4. বৃহস্পতি। 5. একটি ইউরেনিয়াম পরমাণুর প্রোটন সংখ্যা 92 এবং ভর সংখ্যা 232। 6. গোলাপী লাল। 7. লিনাস পাউলিং। 8. যথাক্রমে মতিলাল নেহেরু ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। 9. ফরাসী দেশের BAYONNE নামক স্থানে প্রথম তৈরি হয়েছিল বলে অমন নাম রাখা হয়েছে। 10. 'হাইড পার্ক' লণ্ডনে অবস্থিত।

জুন '89 XI-XII গ্রেড-III

1. ককরেল। 2. 30শে নভেম্বর। 3. কর্ণাটকের গোমতেশ্বর মন্দির, 56 ফিট উঁচু। 4 7.32 মিটার। 5. মান্দারিন। 6. আমেরিকার বিদায়ী রাষ্ট্রপতি রোনাল্ড রেগনের স্ত্রী 'ন্যান্সি রেগন'। 7. গোয়ালিয়রে। 8. অ্যাসিড প্রেণীভুক্ত। 9. রক্তে। 10. ম্যাগনেসিয়াম।

আই কিউ টেস্ট সমাধান

আই-কিউ-টেস্ট / জুন 1989-এর সমাধান

1. (b) Shakespeare। কারণ অন্য নামগুলি চিত্রকরদের। 2. (a) বরফ।
3. (b) আর্কইণ্ডিকেটার।
4. (c) উভয়েরই পরমাণু ব্যাসার্ধ সদৃশ।
5. প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে বিনাশর্তে ইংরেজদের সাহায্য করার জন্য গান্ধীজী ভারতবাসীর কাছে আহ্বান জানিয়েছিলেন। তার জন্যেই গান্ধীজীকে ইংরেজ সরকার 'কাইজার-ই-হিন্দ' স্বর্ণপদক দিয়ে সম্মানিত করেন।

শব্দকূট সমাধান

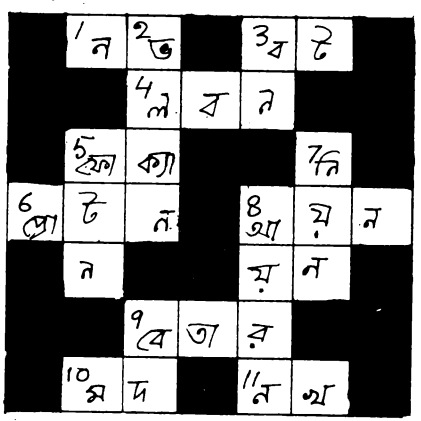

শব্দের কথা

সমীর কুমার ঘোষ

শব্দময় জগতে আমরা বাস করি। ভোরবেলায় পাখীর ডাক থেকে সুরু করে, সারাদিনে নানা শব্দের মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাপন করি। কিন্তু এই এই যে বিভিন্ন ধরণের সব শব্দ, যাদের সঙ্গে আমরা সবাই পরিচিত, তা সৃষ্টি হয় কেমন করে? কোন বস্তুকে আঘাত করলে, স্থিতিস্থাপকতা ধর্মের জন্য, সেই বস্তুর মধ্যে কম্পনের সৃষ্টি হয় আর সেই কম্পন বস্তুর চারধারে বাতাসের মাধ্যমে আমাদের কানে এসে পৌঁছায় এবং আমরা শব্দের অনুভূতি উপলব্ধি করি। এই শব্দের উৎপত্তি, বিস্তার ও ধর্ম সম্বন্ধে বুঝতে হলে কয়েকটি প্রাথমিক জিনিষের সঙ্গে পরিচিত হওয়া প্রয়োজন। সেগুলি হ'ল, কম্পন, কম্পাঙ্ক, বিস্তার তীক্ষ্ণতা, স্বরগ্রামের উচ্চত ইত্যাদি। এগুলি সবই শব্দোৎপত্তির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। বস্তুর কম্পনের ফলেই শব্দের উৎপত্তি হয় আর এই কম্পন প্রতি সেকেণ্ডে কতবার হয়, সেই সংখ্যাকেই বস্তুর কম্পাঙ্ক (frequency) বলে। এই কম্পাঙ্কের উপর নির্ভরশীল যে অনুভূতি, তা হ'ল তীক্ষ্ণতা (pitch)। সেজন্য কম্পাঙ্ক বেশি হলে, তীক্ষ্ণতা বাড়ে। কম্পাঙ্ক কমলে তীক্ষ্ণতাও কমে। আবার কম্পাঙ্ক কম হলে, শব্দ বেশ গভীর মনে হয় কারণ তার তীক্ষ্ণতাও কম।

শব্দের আরও দুটি গুরুত্বপূর্ণ ধর্ম আছে। সেগুলি হ'ল স্বরগ্রামের উচ্চতা (loudness) ও প্রাবল্য (intensity)। এরা পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। শব্দের প্রাবল্য যত বেশি হবে, তার জোরও হবে তত বেশী। এই ব্যাপারটা ঠিকমত বুঝতে হলে, শব্দের এক জায়গা থেকে অন্য আর এক জায়গায় সঞ্চালিত হওয়ার পদ্ধতিটা একটু জানা দরকার। শব্দ সঞ্চালনের প্রধান মাধ্যম হ'ল বাতাস, বলতে গেলে, পৃথিবীর অধিকাংশ শব্দই এই বাতাসের মাধ্যমেই আমাদের কানে এসে পৌঁছাচ্ছে। অবশ্য বাতাস ছাড়াও অন্যান্য নানা মাধ্যমের মধ্য দিয়েও শব্দের প্রসার ঘটতে পারে। আসলে যে কোন স্থিতিস্থাপক (elastic) মাধ্যমেই শব্দ বহন করতে পারে। তবে কঠিন, তরল ও গ্যাসীয় পদার্থ পর্যায়-ক্রমে শব্দ বহনের কাজে উৎকৃষ্ট বলে বিবেচিত হয়। যেমন শূন্য ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেডে, বাতাসের মধ্যে শব্দের গতিবেগ যেখানে প্রতিসেকেণ্ডে 332 মিটার, সেখানে ঐ উষ্ণতায়, জলের মধ্যে গতিবেগ প্রতি সেকেণ্ডে 1500 মিটার এবং লোহার মধ্যে গতিবেগ প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় 5000 মিটার।

এখন বাতাসের মধ্য দিয়ে শব্দ যায় কেমন করে? ধরা যাক্, কোন একটি বাদ্যযন্ত্রের তারে (সেতার, বেহালা ইত্যাদি) আঘাত করা হল। এই আঘাতের ফলে তারটির মধ্যে কম্পনের সৃষ্টি হল এবং ফলে তার চারপাশের বাতাসে তরঙ্গের সৃষ্টি হ'ল। শব্দ তরঙ্গের চাপে বাতাসের মধ্যকার তরঙ্গ কোন জায়গায় সঙ্কুচিত হয়ে পড়বে, আবার কোন জায়গায় বেশ প্রসারিত হবে। বাতাসের মধ্যে এই একজোড়া সঙ্কোচন-প্রসারণ স্তর একটি পূর্ণ তরঙ্গ নির্দেশ করে এবং এই সঙ্কোচন-প্রসারণ ক্রিয়ার প্রভাবেই, শব্দ আমাদের কানের পর্দায় আঘাত করায়। আমরা ঐ বাদ্যযন্ত্রের আওয়াজ শুনতে পাই। ঐ আঘাত যদি খুব জোরে হয়, তাহলে সঙ্কোচন-প্রসারণ ক্রিয়াও খুব শক্তিশালী হয় আর তার ফলে বাড়ে ঐ শব্দের আওয়াজের জোর। এই প্রক্রিয়া ছাড়াও আওয়াজ কমবেশী হওয়া অনেকটা নির্ভর করে মাধ্যমের ধর্মের উপরও। মাধ্যম যদি শব্দের পক্ষে সুপরিবাহী হয়, তাহলে আওয়াজের মাত্রাও আরো জোরে হয়।

শব্দের আর একটি বিশেষ ধর্ম হল তার জাতি (quality) বা সুর (tone)। এই ধর্ম বিভিন্ন হওয়ার ফলেই, আমরা দুই ভিন্ন বাদ্যযন্ত্র থেকে নির্গত একই স্বর (note), একই প্রাবল্য বিশিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও, তাদের চিনে নিতে পারি, অথবা দুই ব্যক্তির গলা থেকে একই স্বর (ধর, 'সা' বা 'রে') একই রকম জোরে নির্গত হলেও, আমরা ঐ ধর্মের সাহায্যে দুজনার গলা চিনে ফেলতে পারি। এর কারণ, দুই যন্ত্রের থেকে বা ঐ দু'জনার গলা থেকে বের হওয়া শব্দের মধ্যে 'মূলসুর' (fundamental) ছাড়াও আরো অন্যান্য 'উপসুর' (Overtones) থাকে। উৎপন্ন শব্দের মধ্যে কতগুলি ও কি প্রকৃতির উপসুর উপস্থিত আছে, তার উপরই নির্ভর করে ঐ শব্দের 'জাতি' (quality বা timbre)। উপস্থিত উপসুরের সংখ্যা ও প্রকৃতিই ঐ শব্দকে আমাদের কাছে চিনিয়ে দিতে সাহায্য করে। এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, আওয়াজের কমবেশী হওয়াটা শুধুমাত্র শব্দ তরঙ্গের প্রাবল্যের উপর নির্ভর করে না—কম্পিত বস্তুর প্রসারের উপরও অনেকটা নির্ভর করে। যেমন ধরা যাক, কোন বাদ্যযন্ত্রের তারে সামান্য আঘাত করা হ'ল

আওয়াজ বেশ জোরে শোনা গেল। এর কারণ কি? কারণ হল, যখন তারটি সামান্য কম্পিত হয়ে শব্দ সৃষ্টি করল, তখন ঐ যন্ত্রের গঠনের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী তার দেহের কাঠের ফাঁপা অংশটিও কাঁপতে থাকল। ফলে, সংশ্লিষ্ট বাতাস আরো বেশী পরিমাণে আন্দোলিত হ'ল এবং শব্দের প্রাবল্য অনেকাংশে বৃদ্ধি পেল। এই ধরণের কম্পনকে 'পরবশ কম্পন' (forced vibration) বলে। বস্তুর নিজস্ব কম্পাঙ্ক (natural frequency) যখন এইভাবে সৃষ্ট পরবশ কম্পনে, অপর বস্তুর (forced) কম্পাঙ্কের সমান হয়, তখন শব্দের প্রাবল্য অত্যন্ত বৃদ্ধি পায় এবং উভয় বস্তুর কম্পনের এই সাম্য অবস্থাকে 'অনুনাদ' (resonance) বলে। প্রায় সকল বাদ্যযন্ত্রে বিশেষভাবে তারযন্ত্রে এই অনুনাদের এক ভূমিকা আছে।

শব্দের আর একটি গুণ বা ধর্মের কথা পরিশেষে আলোচনা করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। সেই গুণটি 'ডপ্‌লার এফেক্ট' (Doppler Effect) নামে পরিচিত। শব্দের তীক্ষ্ণতা যা আমাদের কানে অনুভূতি হয়, সেটা শুধুমাত্র কম্পিত বস্তুর কম্পাঙ্কের উপর নির্ভর করে না। বস্তু, শ্রোতা ও মাধ্যমের মধ্যেকার আপেক্ষিক গতির উপরও নির্ভর করে। রেলষ্টেশনের প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায়, একটি ট্রেন যখন দ্রুতবেগে তার বাঁশী বাজাতে বাজাতে ষ্টেশনের দিকে আসতে থাকে বা ষ্টেশন থেকে দূরে চলে যেতে থাকে, তখন এই 'ডপ্‌লার এফেক্ট' খুব স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়।

আলোর মতই, শব্দতরঙ্গ যখন কোন বস্তুতে বাধা পায়, তখন তার শক্তির কিছু অংশ প্রতিফলিত হয়, যার ফলে প্রতিধ্বনির সৃষ্টি হয়। এই প্রতিধ্বনি শোনার অভিজ্ঞতা আমাদের সকলেরই আছে। বড় খালি ঘরে বা পাহাড়ী অঞ্চলে এই প্রতিধ্বনি খুব স্পষ্টভাবে শোনা যায়। এই প্রতিধ্বনি স্পষ্টভাবে শুনতে হলে, বস্তু ও প্রতিফলকের মধ্যেকার দূরত্ব কমপক্ষে 56 ফুট হওয়া প্রয়োজন এবং দূরত্ব যত বেশী হবে, তত দেরীতে শব্দের প্রতিধ্বনি শোনা যাবে। বার বার প্রতিফলনের ফলে, অনেক সময়ে একই মূলশব্দের অনেকগুলি প্রতিধ্বনি পর্যায়ক্রমে শোনা যায়। মেঘের গুড়গুড় আওয়াজ প্রকৃতপক্ষে, শব্দ বিভিন্ন স্তরের মেঘ থেকে বারবার প্রতিফলিত হয় বলেই, ঐরকম শোনায়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, ফ্রান্সে ভার্দুঁয়া নামে একটি শহর আছে। সেখানে দুইটি সমান্তরাল দেওয়াল আছে যার মধ্যেকার দূরত্ব প্রায় 164 ফুট। এই দুই দেওয়ালের মাঝে দাঁড়িয়ে কোনো শব্দ করলে দেওয়াল দুইটি থেকে বারবার প্রতিফলিত হওয়ার ফলে, অন্ততঃ 10/12 বার প্রতিধ্বনি শোনা যায়। সেজন্য এটি এক বিশেষ দর্শনীয় স্থান হিসাবে পরিচিত।

বিশ্বভারতী—শান্তিনিকেতন।

পড়াশোনা

মজার সংখ্যা—1989

সুবীর চক্রবর্তী

এটা 1989 সাল। 19 এবং 89 এই সংখ্যা দুটোর মধ্যে অনেক মজার মিল ও সম্পর্ক আছে। তার কিছু কিছু আমি উল্লেখ করছি।

1. প্রথমেই বলা যায় 19 এবং 89 দুটোই মৌলিক সংখ্যা। অর্থাৎ এক এবং সংখ্যাটি ছাড়া এদের আর কোন উৎপাদক নেই।

2. আবার $1+9=10$; 1019 মৌলিক এবং $8+9=17$; 1789 ও মৌলিক। 1109 এবং 1879 এ দুটোও মৌলিক।

3. 19 কে উল্টে লিখলে হয় 91 এবং 89 কে উল্টে লিখলে হয় 98, দুটোই 7 দ্বারা বিভাজ্য।

4. 19 কে দুটো পর পর বর্গ সংখ্যার বিয়োগ ফল হিসাবে প্রকাশ করা যায়। $19=10^2-9^2$ আবার 89 কেও তাই করা যায় $89=45^2-44^2$।

5. 180° ঘুরিয়ে দিলে 19 এবং 89 যথাক্রমে হবে 61 এবং 68. এ দুটোকেই দুটো বর্গের সমষ্টি হিসাবে প্রকাশ করা যায়। $61=6^2+5^2$; $68=8^2+2^2$।

6. 19 এর এককের অঙ্ক 9 কে up-side-down করলে হয় 6. 169 এবং 196 দুটোই বর্গ সংখ্যা। আবার 6 এর বর্গ 36. 36কে 1 এবং 9 এর মাঝে কিম্বা ডান পাশে বসালে বর্গ সংখ্যা হয় 1 অর্থাৎ $1369=37^2$ এবং $1936=44^2$। 89 এর দশকের অঙ্কের বর্গ 64. 64কে 8 এবং 9 এর মাঝে বসালে হবে $8649=94^2$. আবার 89কে 180° ঘোরালে হয় 68. এখন 6889 ও একটি বর্গ সংখ্যা।

7. 19 এর বর্গ এবং 89 এর বর্গ উভয়কেই তিনটে বর্গের সমষ্টি রূপে প্রকাশ করা যায়।

$$19^2=1^2+6^2+18^2$$
$$89^2=9^2+28^2+84^2$$

8. আবার 19 এবং 89 দুটোর গুণফলকে তিনটে ঘন সংখ্যার যোগফল হিসাবে প্রকাশ করা যায়ঃ

$$19^3=3^3+10^3+18^3$$
$$89^3=17^3+40^3+86^3$$

9. 89 এর বর্গ 7921 ; $79+21=100$ একটি বর্গ সংখ্যা 19 এর বর্গ 0361 ; $03+61=64$ একটি বর্গ সংখ্যা।

গ্রাম—মালঞ্চ, পোস্ট—মালঞ্চ/মাহীনগর, দঃ 24-পরগণা

শ্রীঅমরনাথ রায় লিখিত 'রসায়ন ভারতী' সম্বন্ধে অভিমত

মাতৃভাষায় বিজ্ঞানশিক্ষা ছাড়া বিজ্ঞানের উন্নতি সম্ভব নয় পাশ্চাত্য দেশগুলির দিকে তাকালেই এটি আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায়। আমাদের দেশ আজ বিজ্ঞান জগতে পশ্চিমের দেশগুলির সঙ্গে সমান ভাবে চলতে পারছে না তার কারণ আমাদের মাতৃভাষার বদলে ইংরাজী ভাষায় বিজ্ঞান চর্চ্চার পদ্ধতি। মাতৃভাষায় বিজ্ঞান আয়ত্ব করা এবং তার প্রয়োগ বিদ্যা জানা যত সহজ অন্য কোন ভাষায় তত সহজ ভাবে সম্ভব হয় না। আর তাছাড়া বিদেশী ভাষাকে আয়ত্ব করাও বেশ সময়সাপেক্ষ। নিজের চিন্তাধারাকে বিদেশী ভাষায় প্রকাশ করার সময় বারে বারে মন চঞ্চল হয়ে ওঠে এই ভেবে যে ঠিক মতন ভাবধারা প্রকাশ করা যাচ্ছে কিনা, তার ফলে ঠিকমতন সরল সহজভাবে ভিতরের ভাবকে ব্যক্ত করা অনেক সময় সম্ভবপর হয় না। যে দেশে অধিকাংশ লোকই নিরক্ষর বা অর্ধ-শিক্ষিত সে দেশে এক বিদেশীভাষার উপরে বিজ্ঞানকে ছেড়ে দিলে ভবিষ্যতে আমরা না জানি আরও কত পিছিয়ে পড়বো।

বাংলাভাষায় বিজ্ঞান চর্চ্চা নিয়ে বহু তর্ক-বিতর্ক হয়ে গেছে। পরিভাষার অভাব বার বার আমাদের সামনে বাধা সৃষ্টি করেছে। কিন্তু সেই অজুহাতে ইংরাজীকে আঁকড়ে ধরে রাখার কোন যুক্তি নেই। আজ এই অর্ধশতাধিক বয়সে যেন একটু আশার আলো দেখছি—নতুনেরা পুরোনো বাধাকে অতিক্রম করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন। বিশ্বাস করি সে বাধা একদিন আমরা অতিক্রম করতে সক্ষম হবো।

রসায়ন ভারতী

অমরনাথ রায় ॥ করুণা প্রকাশনী, কলকাতা-9

দাম ঃ 30 টাকা

অফুরন্ত পরিশ্রম ও আপ্রাণ চেষ্টার ফলে শ্রীঅমর নাম রায় "রসায়ন ভারতী" বাংলাভাষাতেই প্রকাশ করেছেন এর জন্য তাঁকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। যথা সময়ে এই বইটির প্রকাশন আমাদের নবীন ও প্রবীণ বিজ্ঞানীদের উৎসাহ দেবে সে বিষয়ে আমি সুনিশ্চিত। পরিভাষার অভাব যে মোটেই কোন বাধা নয় তার প্রমাণ তিনি বইখানিতে রাখবার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। কিছু জায়গায় আরও কিছু অভিব্যক্তি পরিস্ফুট করা যেতো—তবুও তাঁর এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবে না। ছাত্র সমাজে এবং বিজ্ঞানী মহলে তাঁর বইটি নিঃসন্দেহে স্থান করে নিতে পারবে।

শ্রীঅরমরনাথ রায়ের বাংলাসাহিত্যে এই অভিনব অবদানের জন্য কৃতজ্ঞতা জানাই।

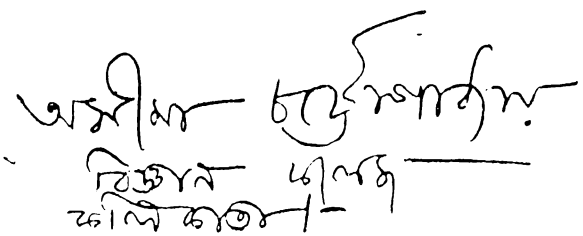

জ্ঞান-বিজ্ঞানের পত্রিকা

এক অভিনব পত্রিকা আমাদের হাতে এসেছে প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলা-দেশ-এর রাজধানী ঢাকা থেকে। পত্রিকার নাম 'শিক্ষা ও বিজ্ঞান'। ত্রৈমাসিক পত্রিকা। বর্তমান যুগ বিজ্ঞানের যুগ। আজকের দিনে যিনি যে পেশাতেই নিয়োজিত থাকুন না কেন, সকলেরই কিছু না কিছু বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্য সামনে রেখে বাংলা দেশের জাতীয় মাধ্যমিক ও বিজ্ঞান উন্নয়ন কেন্দ্র মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষকদের পেশাগত মান উন্নয়নের জন্য 'শিক্ষা ও বিজ্ঞান' নামক ত্রৈমাসিক পত্রিকাটি প্রকাশ করছেন। এর তিনটি সংখ্যা আমরা পেয়েছি। এর প্রতিটি রচনাই উদ্দেশ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে রচিত হয়েছে। পরিবেশ চেতনা ও শিক্ষা-ব্যবস্থা, বিজ্ঞান বনাম মনোবিজ্ঞান; ল্যাবরেটারি যন্ত্রপাতি সংরক্ষণ, মেরামত ও ব্যবস্থাপনা; পারমাণবিক ও সৌর-শক্তির ব্যবহার; বিদ্যুৎ ও পরমাণু; শক্তির উৎস; রসায়নের ভাষা ইত্যাদি রচনাগুলি পত্রিকাটির উদ্দেশ্যে ও উন্নত মানের পরিচায়ক। নিত্যনূতন আবি-ষ্কারের মাধ্যমে প্রতিদিন মানুষের জ্ঞানের পরিধি বাড়ছে, শিক্ষাদান ও শিক্ষাগ্রহণ পদ্ধতিরও পরিবর্তন ঘটছে। শিক্ষাকে যদি ফলপ্রসূ করতে হয় তাহলে বিদ্যালয় স্তরের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের এ সব বিষয় অবহিত রাখা প্রয়োজন। পত্রিকায় প্রকাশিত রচনাগুলি পড়ে মনে হচ্ছে যে জাতিকে অজ্ঞতার অন্ধকার ও অভিশাপ থেকে মুক্ত করে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণে সহায়তা করার পক্ষে এই ত্রৈমাসিক পত্রিকাটি খুবই সহায়ক হবে।

—বিবেক রায়

রেচন ঃ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর পলিন বিহারী সাউ

1. **প্র—রেচন কাহাকে বলে ?**

উ—যে প্রক্রিয়ায় বিপাকীয় কার্যের ফলে কোষ মধ্যস্থিত অপ্রয়োজনীয় অথবা ক্ষতিকারক বস্তু জীব দেহ হইতে পরিত্যক্ত হয়, তাহাকে রেচন বলে।

2. **প্র—প্রাণীদেহে উদ্ভূত রেচন পদার্থগুলি কি কি ?**

উ—কার্বন-ডাই-অক্সাইড, জল, নাইট্রোজেনঘটিত বর্জ্য পদার্থ।

3. **প্র—উদ্ভিদের প্রধান রেচন পদার্থগুলির নাম কি কি ?** **উ**—গঁদ, রজন, তরুক্ষীর, উপক্ষার, জৈব অম্ল, উদ্বায়ী তেল।

4. **প্র—সরলতম রেচন প্রক্রিয়া কি ?** **উ**—ব্যাপন।

5. **প্র—কুইনিন, মরফিন, নিকোটিন কি জাতীয় বিপাকের ফলে উৎপন্ন হয় ?**

উ—এইগুলি নাইট্রোজেন বিপাকের ফলে উৎপন্ন হয়।

6. **প্র—গঁদ কোন প্রক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন হয় ?**

উ—শর্করা বিপাকের ফলে উৎপন্ন হয়।

7. **প্র—খয়ের কি ?**

উ—ইহা ট্যানিন জাতীয় এক প্রকার রেচন পদার্থ।

8. **প্র—রবার কি ?**

উ—ইহা এক প্রকার তরুক্ষীর জাতীয় রেচন পদার্থ।

9. **প্র—র‍্যাফাইড কি ?**

উ—কচু, ওল, প্রভৃতি গাছে ক্যালসিয়াম অক্সালেট জাতীয় ধাতব কেলাসকে র‍্যাফাইড বলে।

10. **প্র—সিস্টোলিথ কি ?**

উঃ - রবার, বট, অশ্বত্থ প্রভৃতি গাছের পাতায় ক্যালসিয়াম কার্বোনেট জাতীয় ধাতব কেলাসকে সিস্টোলিথ বলে।

11. **প্র—র‍্যাফাইড কিসে দ্রবণীয় ? উ**—জৈব অম্লে।

12. **প্র—কচু খাইলে গলা কুট্‌কুট্‌ করে কেন ?**

উ—র‍্যাফাইড কেলাসগুলি গলায় ফুটিয়া যায় বলিয়া কচু খাইলে গলা কুট কুট করে।

13. **প্র—তরুক্ষীর কি ?**

উ—আকন্দ, করবী, কাঁঠাল প্রভৃতি দুধের মত বা জলের মত যে তরল পদার্থ বাহির হয় তাহাকে তরুক্ষীর বলে।

14 **প্র**—অ্যামিবার রেচন অঙ্গ কি ?

উ—সংকোচনশীল গহ্বর।

15. **প্র—হাইড্রা কিসের মাধ্যমে, কোন প্রক্রিয়ায় রেচন ক্রিয়া সম্পন্ন করে ?**

উ—হাইড্রা প্লাসমাপর্দার মাধ্যমে, ব্যাপন প্রক্রিয়ায় রেচন ক্রিয়া সম্পন্ন করে।

16. **প্র—ফ্লেমকোষ কি ?** **উ**—চেপ্টাকৃমি পর্বের প্রাণীদের রেচন অঙ্গকে ফ্লেমকোষ বলে।

17. **প্র—নেফ্রিডিয়াম কাহাকে বলে ?**

উ—অঙ্গুরীমাল পর্বের প্রাণীদের রেচন অঙ্গকে নেফ্রিডিয়াম বলে।

18. **প্র—সবুজ গ্রন্থি কাহাকে বলে ?**

উ—চিংড়ির রেচন অঙ্গকে সবুজ গ্রন্থি বলে।

19. **প্র—ম্যালফিজিয়ান টিউবিউল কি ?**

উ—পতঙ্গ শ্রেণীর প্রাণীদের রেচন অঙ্গই হইল ম্যালফিজিয়ান টিউবিউল।

20. **প্র—উন্নত প্রাণীর প্রধান রেচন অঙ্গ কি ? উ**—বৃক্ক।

21. **প্র—মানুষের রেচন অঙ্গ কি কি ?**

উ মানুষের রেচন অঙ্গ হইল ফুসফুস, বৃক্ক, ত্বক।

22. **প্র—ফুসফুসের মধ্যদিয়া কোন প্রকার রেচন পদার্থ নির্গত হয় ?**

উ—কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও উদ্বায়ী পদার্থ সমূহ।

23. **প্র—বৃক্কের মধ্য দিয়া কোন প্রকার রেচন পদার্থ নির্গত হয় ?**

উ—নাইট্রোজেনঘটিত দ্রবণীয় অপ্রদাহী পদার্থ সমূহ।

24. **প্র—নেফ্রন কি ? উ**—বৃক্কের একককে নেফ্রন বলে। ইহা এক প্রকার নালী বিশেষ।

25. **প্র - ব্যোমেনস্‌ ক্যাপসিউল কি ?**

উ—নেফ্রনের অগ্রভাগে পেয়ালাকৃতি অংশকে ব্যোমেনস্‌ ক্যাপসিউল বলে।

26. **প্র—গ্লোমেরিউলাস কি ?**

উ—অন্তর্বাহী ধমনী ব্যোমেনস ক্যাপসুলে যে জালকের সৃষ্টি করে তাহাকে গ্লোমেরিউলাস বলে।

27. **ব্যোমেনস্‌ ক্যাপসুলে কোন প্রক্রিয়ায় রক্ত পরিশ্রুত হয় ? উ**—অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায়।

28. **প্র—ইউরিয়া, ইউরিক অম্ল কোথায় সৃষ্টি হয় ?**

উ—যকৃতে প্রোটিনের নাইট্রোজেন ঘটিত অংশ হইতে।

29. **প্র—ঘর্ম কি লইয়া গঠিত ?**

উ—জল, লবন এবং সামান্য স্নেহ ও নাইট্রোজেন ঘটিত পদার্থ লইয়া গঠিত।

30. **প্রঃ—কোন্‌ রেচন পদার্থ জমির উর্বরতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে ?**

উ—নাইট্রোজেন ঘটিত বর্জ্য পদার্থ।

ইন্দা, বোসপাড়া, খড়্গপুর, মেদিনীপুর।

মাছের রোগ

দেবাশীষ কর

আমার কিশোর ভাই-বোনদের জন্য লিখছি।

মাছ ও বাঙ্গালী শব্দ দুটি যেন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। মাছ ছাড়া বাঙ্গালীর অন্ন যেমন গলাধঃকরণ হয় না, তেমনি বঙ্গদেশ ব্যতীত অন্য কোনও স্থানে এত বিভিন্ন প্রকারের মাছ প্রাকৃতিক পরিবেশে পাওয়া যায় না। বাস্তবিকই মাছ বাঙ্গালীর যত প্রিয়, মৎস্যকুলও বঙ্গদেশ ব্যতীত অন্য কোথাও এত কদর পায় না। ভাবতে পারো, সেই মাছের আজ রোগ হয়েছিল। বিপন্ন হয়েছিল লক্ষ লক্ষ দরিদ্র মৎস্যজীবি। আতংকগ্রস্ত হয়েছে আপামর জন সাধারণ। আমাদের আহারের তালিকা থেকে মাছ সরে গিয়েছিল। তোমাদের প্রশ্ন জাগতে পারে কিভাবে মাছ হঠাৎ রোগগ্রস্থ হ'য়। তবে এস, একজন জিজ্ঞাসু হিসেবে আমরা ধারাবাহিকভাবে এর কারণ অনুসন্ধানে ব্রতী হই।

তোমরা নিশ্চয়ই জানো, বঙ্গদেশসহ সমগ্র পূর্বাঞ্চল প্রাকৃতিক জলাশয়ে পরিপূর্ণ। এই সকল জলাশয়ের মুক্ত পরিবেশে বাসরত মাছ সকল কখনও কখনও রোগাক্রান্ত হয়ে থাকে। মাছের রোগ সাধারণতঃ নিম্নলিখিত কারণ সমূহের জন্য হয়ে থাকে।

1. জল তথা মাটির প্রদূষণ
2. পারমাণবিক তেজস্ক্রিয়া
3. ভারী ধাতুজনিত প্রদূষণ
4. ব্যাকটিরিয়ার আক্রমণ
5. ভাইরাসের আক্রমণ
6. ছত্রাক, ক্রিমি ও সন্ধিপদী প্রাণীর আক্রমণ

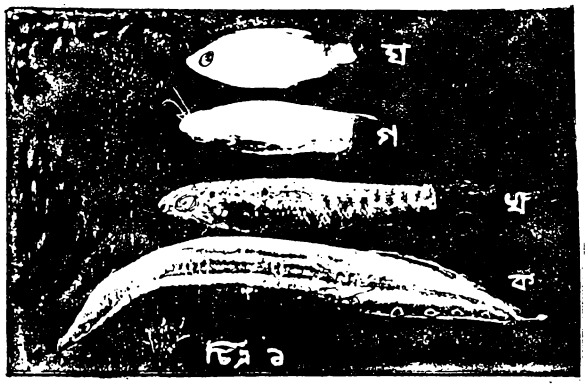

চিত্র ১

রোগাক্রান্ত বরাক উপত্যকার চারিটি প্রজাতির মাছ

মাছে দেখা দেওয়া যে রোগটি আমাদের সবাইকে ভাবিয়ে তুলেছে, তা 1988 ইং-এর জুলাই মাসে আসামের বরাক উপত্যকায় প্রথম দেখা দেয়। যেহেতু স্মরণাতীত কালে এই প্রকারের রোগ আমাদের বরাক উপত্যকার মাছে দেখা যায়নি, তাই মাছের রোগ সৃষ্টিকারী উপরোক্ত কারণ সমূহ একটি একটি করে বিশ্লেষণ করা শুরু করলাম।

কাছাড় জিলার বিভিন্ন জলাশয় পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেল যে বেশির ভাগ জলাশয়ের মাছই এই রোগে আক্রান্ত। তবে এখানে উল্লেখ্য যে শুধুমাত্র চারিটি প্রজাতির মাছ এই রোগের দ্বারা বহুলাংশে আক্রান্ত। এই চারিটি প্রজাতি (চিত্র-1) ও তাহাদের মধ্যে দেখা রোগের লক্ষণসমূহ নিম্নরূপ ঃ

(ক) **বাইম্**—(স্থানীয় ভাষায় 'ফাটা বাইম্', চিত্র 1-ক) সাধারণতঃ, এর উদরাঞ্চলের অংশবিশেষে চামড়া উঠে যেতে দেখা যায়।

(খ) **চ্যাং**—(চিত্র 1-খ) ঃ সাধারণতঃ এর ল্যাজের ভূমি অঞ্চলের চামড়া উঠে পেশীর বিনাশ দেখতে পাওয়া যায়। এছাড়া, এই প্রজাতির মাছে মধ্যে মধ্যে "স্ফীতকায় চক্ষু" (exophthalmos) ও দেখা যায়।

(গ) **ট্যাংরা**—(স্থানীয় ভাষায় গায়ে দাগ কাটা টেংরা, (1-গ) ঃ সাধারণতঃ এর পৃষ্ঠ, বক্ষ ও পায়ু পাখনার ভূমি অঞ্চলে ফিকে লাল রং-এর ক্ষত দেখা যায়।

(ঘ) **পুঁটি**—(চিত্র 1-ঘ) ঃ সাধারণতঃ, এর পৃষ্ঠ ও পায়ু পাখনার নীচে ফিকে লাল রং-এর ক্ষত দেখা যায়।

এখানে উল্লেখ্য যে বিভিন্ন সময়ে এই চারিটি প্রজাতির মাছের রোগের প্রকটতায় তারতম্য দেখা গিয়েছে। যথা—কোনও সময়ে রোগাক্রান্ত পুঁটি বাকী তিনটি প্রজাতির মাছের তুলনায় অনেক বেশি সংখ্যায় পাওয়া গিয়েছে; অন্য সময়ে, রোগাক্রান্ত চ্যাং অধিক সংখ্যায় পাওয়া গিয়েছে ইত্যাদি। অন্যান্য রোগাক্রান্ত প্রজাতি সমূহের মধ্যে উল্লেখ-যোগ্য হল—মাগুর, শিঙি, শোল, শাল, বালিগড়া, মৌরলা, চাঁদা ইত্যাদি (চিত্র-2)।

রোগ নির্ধারণের প্রচেষ্টার প্রথম পন্থাস্বরূপ কাছাড় জিলার জল ও মৃত্তিকা দূষিত কিনা, সেটা নিরূপণের কাজ হাতে নিলাম। এখানকার বৃহত্তম হাপড় "চাতলা"-এর জল ও মাটির ভৌত রাসায়নিক গুণাগুণ পক্ষকাল অন্তর অন্তর বিশ্লেষণ করে দেখা গিয়েছে যে জলের তাপমাত্রা, অম্লতা, দ্রবীভূত অম্লজান মুক্ত অঙ্গার গ্যাস ও সম্মিলিত

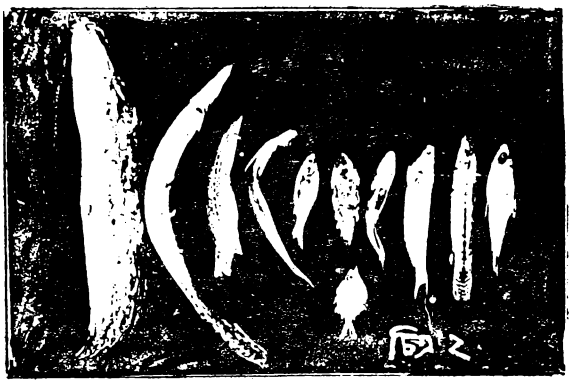

অপেক্ষাকৃত কম আক্রান্ত বরাক উপত্যকার অবশিষ্ট প্রজাতির মাছ

ক্ষরতা এবং মাটির তাপমাত্রা, মোট দ্রবীভূত লবণ, জৈব অঙ্গার ও প্রাপ্য NPK-এর মান স্বাভাবিক-এর চেয়ে খুব একটা বিচ্যুত হয়নি। তবে জলের সম্মিলিত ক্ষরতার মান স্বাভাবিকের তুলনায় কিছুটা নিম্নে পাওয়া গিয়েছে। আমার ও পশ্চিমবঙ্গের মৎস্যবিজ্ঞানী শ্রীরাধানাথ পাল মহোদয়ের মতানুসারে এটা মাছে রোগ উদ্ভূত হওয়ার একটি কারণ হতে পারে। এছাড়া, উক্ত জিলার বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত প্রায় কুড়িটি জলাশয়ের জল ও মৃত্তিকার উপরিউক্ত বিষয়সমূহ অনুসন্ধান করে উভয়েরই কোনও অস্বাভাবিক মান পাওয়া যায়নি। তদুপরি, এই সকল জলাশয়ের জলজ উদ্ভিদের জৈবভার ও অনুজীব সকলের প্রজাতির গঠনে কোনওরূপ অস্বাভাবিকতা পাওয়া যায়নি। উক্ত ফলাফল সমূহ ইহাই নির্দেশিত করে যে কাছাড় জিলার জলাশয়সমূহ জৈবিকভাবে প্রদূষিত হয়নি। এখানে স্মরণ করা যেতে পারে যে দূষিত জলে সাধারণতঃ অম্লের আধিক্য ও দ্রবীভূত অক্সিজেনের অল্পতা লক্ষিত হয়।

অতঃপর রোগাক্রান্ত মাছ কোনও প্রকার পারমাণবিক বিক্রিয়ার দ্বারা প্রভাবিত কিনা তাহা নিরূপনের জন্য গামা-রে স্পেকট্রোমিটার দিয়ে পরীক্ষা করলাম। দেখা গেল যে মানুষের দেহে ক্ষতি করতে সক্ষম এই রকম স্তর পর্যন্ত মাছই তেজস্ক্রিয়ার দ্বারা প্রভাবিত হয়।

এরপর ভারী ধাতু দ্বারা প্রদূষণের মাত্রা নির্ধারণের জন্য রোগাক্রান্ত মাছের কোষে পারদ, সীসা, আর্সেনিক ও ক্যাড্‌মিয়াম-এর পরিমাপ এ্যাটোমিক এ্যাব্‌সর্‌প্‌সান্‌ স্পেকট্রোফোটোমিটার দিয়ে নির্ধারণ করা হয়। দেখা গিয়েছে যে কোনও রোগাক্রান্ত মাছেই উপযুক্ত ধাতু সফল, মানুষের দেহাভ্যন্তরে ক্ষতি করতে পারে, এই রকম পরিমাণে পাওয়া যায় নি।

স্ক্যানিং ইলেকট্রন মাইক্রোসকোপ্‌ দিয়ে আলোকচিত্র (চিত্র 3 ও 4) নিয়ে রোগাক্রান্ত মাছের কোষে বিভিন্ন প্রকারের অসংখ্য জীবাণু পাওয়া গেছে যেগুলি এখন সনাক্ত-করণের চেষ্টা চলছে।

যখন দেখা গেল যে মাছের মধ্যে এই রোগ জল ও ও মৃত্তিকা প্রদূষণ, পারমাণবিক তেজস্ক্রিয়া অথবা কোনও ভারী-ধাতু দ্বারা প্রদূষণের জন্যও নয়, তখন ব্যাকৃটিরিয়া (অনুউদ্ভিদ)-এর কাজ হাতে নিলাম। শিলচর চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ে প্রতি রোগাক্রান্ত মাছের প্রজাতি থেকে কৃত্রিম মাধ্যমে ব্যাকৃটিরিয়ার বৃদ্ধি ঘটিয়ে মাত্র তিনটি প্রকার-এর ব্যাকৃটিরিয়া পাওয়া গেছে যেগুলি সচরাচর লভ্য এ্যান্টি-বয়োটিক্‌ দ্বারা প্রতিরোধ্য। গিনিপিগ-এর চর্মের তলদেশে উক্ত জীবাণুসকল প্রবেশ করিয়ে 90 দিন পরেও গিনিপিগ্‌-এ

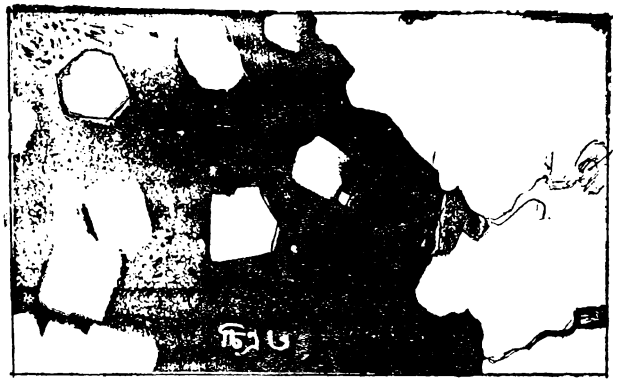

স্ক্যানিং ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ দ্বারা গৃহীত আলোক চিত্রে রোগাক্রান্ত পুঁটিমাছের ল্যাজে প্রাপ্ত জীবাণুসকল

কোনও প্রকারের বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখতে পাওয়া যায় নি। 14 দিনের ভ্রূণসম্পন্ন মুরগীর ডিমের chorio-allantoic

স্ক্যানিং ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ দ্বারা গৃহীত আলেকচিত্রে রোগাক্রান্ত চ্যাং মাছের ল্যাজে প্রাপ্ত জীবাণুসকল

পর্দায় উক্ত জীবাণুসকল প্রবেশ করিয়ে ছ'দিন পর উক্ত পর্দার পৃষ্ঠদেশে কিছু জীবাণুর বৃদ্ধি দেখা গেছে। এই প্রকারের বৃদ্ধি থেকে রোগাক্রান্ত মাছের কোষে ভাইরাসের উপস্থিতি একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

আমার গবেষণা চলছে। কোনও রকমের নির্দিষ্ট উপসংহারে উপনীত হওয়ার সময় এখনও আসেনি। তথাপি নিম্নলিখিত তথ্যসমূহ প্রয়োজনীয় হতে পারে, এই মনে করে দিলাম ঃ

যে তিনটি ধরনের ব্যাকৃটিরিয়া পাওয়া গেছে, যথা—E. coli, Klebsiella aeruginosa ও Pseudomonas-এর প্রজাতি, ইহাদের প্রতিটি মানুষের দেহে আন্ত্রিক প্রদাহ বা তদনুরূপ রোগ করতে সক্ষম। সাধারণতঃ এই সকল ব্যাকৃটিরিয়া রক্তে বাস করে না, তবে অন্ত্রের কোষ-প্রাচীরে এরা কিছু ক্ষতিকারক বস্তু ক্ষরণ করে যা পরে রক্তে প্রবেশ করে। মানুষ সাধারণতঃ ভালভাবে রান্না করে মাছকে খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে। উচ্চ তাপমাত্রার কোনও পরজীবিই সক্রিয় অবস্থায় থাকতে পারে না। ব্যাকৃটিরিয়া, এমন কি ভাইরাস্-এর ক্রিয়াও যদি থেকে থাকে, তাহা 39° সে-এর ঊর্ধে প্রশমিত হয়। এছাড়া ভাইরাসের অপ্রকাশিত অবস্থিতির অধ্যায় (inculoation perlod) এক থেকে পঁচিশ দিন পর্যন্ত স্থায়ী হয়ে থাকে। সুতরাং একই ভাইরাস্ দু-তিন বৎসর পর আবার একই মানুষে তার নিজস্ব পূর্বেকার সংক্রমণ থেকে আবার সক্রিয় হয়ে উঠবে, এরূপ কল্পনা করাটা বৈজ্ঞানিকভাবে অমূলকই বলা যেতে পারে। অধিকন্তু ভাইরাস্ সাধারণতঃ পোষক-বিশেষ হয়ে থাকে। তাই বরাক উপত্যকায় বর্তমান আনুমানিক 70টি প্রজাতির মাছের মধ্যে কেবল চারিটি প্রজাতিই বহুল ভাবে এই রোগের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। একই কারণে বিড়ালকে অনেকগুলি কাঁচা রোগাক্রান্ত মাছ খাওয়ানোর পরও দেখা গেছে যে আজ পর্যন্ত বিড়ালটির কিছুই হয়নি। অনুরূপ কারণে গিনিপিগ্-ও সুস্থ রয়েছে। সুতরাং রোগাক্রান্ত মাছ মানুষের দেহের পক্ষেও খুব একটা ক্ষতি-কারক বলে মনে হয় না।

তাই আমার কিশোর ভাই-বোনেরা, তোমাদের মধ্যে সঞ্চিত অফুরন্ত স্থিতিশক্তির রূপান্তর ঘটিয়ে, আমাদের ধীবর সম্প্রদায়ের এই দুর্দিনে, এটাকে জাতীয় বিপর্যয় হিসেবে গণ্য করে, আমার অনুরোধ তোমরা আপামর জনসাধারণকে বোঝাতে চেষ্টা করবে যে মাছের এই সাম্প্রতিক রোগের দরুণ আতংকগ্রস্ত হওয়ার মত কিছুই নেই।

অধ্যাপক, প্রাণীবিজ্ঞান বিভাগ, গুরুচরণ কলেজ, শিলচর, আসাম।

মাছেদের অনুভূতি / মানস কুণ্ডু

অনুভূতি গ্রহণের জন্য মানুষের দেহে রয়েছে পাঁচটি ইন্দ্রিয় —চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা এবং ত্বক। এদের এক একটির কাজ এক একরকম। দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ, স্বাদ ও স্পর্শের অনুভূতি গ্রহণের জন্যেই রয়েছে এই পাঁচটি ইন্দ্রিয়।

মাছেদেরও দেখার জন্য রয়েছে দুটো বড় বড় চোখ। আমাদের চোখকে রক্ষা করার জন্য যেমন চোখের পাতা আছে, মাছেদের কিন্তু তেমন কোন পাতা নেই। তাই মাছেরা যখন ঘুমোয় তখনও চোখ খোলাই থাকে, কোন অবস্থাতেই চোখ বন্ধ হতে পারে না।

শোনার ব্যাপারেও মাছেরা একটু অন্যরকম। এদের না আছে কর্ণছিদ্র না কর্ণছিদ্র। শুধু মাথার ভেতরে কয়েকটি কর্ণশিলা (statolith) নামের অস্থি থাকে। এগুলিই জলের মধ্যের কম্পনকে ধরে শোনার কাজ চালায়। আবার দেহের ভারসাম্য রক্ষার কাজটিও এরাই করে থাকে।

বহু প্রাণীর ক্ষেত্রেই নাক গন্ধ শোঁকার কাজটি যেমন করে তেমনি একই সঙ্গে নিঃশ্বাস নেবার কাজেও সাহায্য করে। কিন্তু মাছের নাক শুধুমাত্র গন্ধ নেবার ব্যাপারেই সাহায্য করে। এদের নাকের সঙ্গে মুখের সরাসরি যোগা-যোগও নেই।

মাছেরা অভাগা এমনই যে স্বাদ নেবার জন্য এদের জিভ পর্যন্ত নেই। কাজেই কোন খাদ্যের স্বাদ কেমন তা সারা জীবনেও এরা জানতেই পারে না। শুধু বাঁচার জন্যই খাবার পেলেই এরা গিয়ে খায়।

স্পর্শানুভূতির ব্যাপারেও মাছেরা অনেকটাই আলাদা রকম। বেশির ভাগ মাছের দেহ ঢাকা থাকে আঁশে। কাজেই সেখানে স্পর্শ ততটা অনুভূতি জাগায় না। বোয়াল, মাগুর, জিওল জাতীয় মাছের মুখে থাকে গোঁফ। এই গোঁফই কাজ করে স্পর্শানুভূতি গ্রহণের। আর রুই, কাতলার মত মাছের দেহের দুপাশে কানকো থেকে পায়ুছিদ্র পর্যন্ত রয়েছে লম্বালম্বি দাগ। এই দাগটির নাম পার্শ্বরেখা। এই পার্শ্বরেখাই মাছের স্পর্শেন্দ্রিয় হিসাবে কাজ করে। শুধু তাই নয় এই রেখার সাহায্যে মাছ জলের গভীরতা উষ্ণতা, জলে অ্যাসিডের পরিমাণ ইত্যাদিও বুঝতে পারে।

রবীন্দ্রনগর, পোঃ—চাকদহ, জেলা—নদীয়া

বাঙালির মাছ ভাত

কিন্নর রায়

সেই কোন আদ্যিকালে 'অন্নদামঙ্গল'-এর ঈশ্বর পাটনি ঈশ্বরীর কাছে প্রার্থনা করেছিল—'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে।'

শুধু দুধ ভাত নয়, মাছে-ভাতে বাঁচার স্বপ্নও বাঙালি দেখেছে তার জীবন-যাপনের গোড়ার দিনটি থেকে। সীতাশাল, চামরমণি, গোবিন্দভোগ, কামিনী, কাটারিভোগ, কি সব বিচিত্র চালের নাম! অনেক অনেক দিন পর রেশনের কাঁকরমণি, আই. আর. এইচ, তাইচুং—সেই সব ভাত আর তাদের আস্বাদের বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে। রেশনের দৌলতেই আমরা জানতে পারি চালের নাম হয় বেঙ্গল ফাইন, সুপার ফাইন আর বাসমতী।

ভাতের সঙ্গে মাছের নানান পদ, নিদেন পক্ষে এক আধ টুকরো, বাঙালির নিত্য অভ্যাসে। মাটির হাঁড়িতে কাঠের আগুনে নতুন চালের ভাত, আলু, কপি, সিম সেদ্দর সঙ্গে কাঁচা সর্ষের তেল, কাঁচা লঙ্কা আর নুনের স্মৃতি এখনও অনেক বাঙালির জিভে। এ স্মৃতি শীতের স্মৃতি।

পূর্ব বাংলা থেকে যে মানুষেরা দেশ ভাগের পর এপার বাংলায় এসেছেন, তাঁদের কথায় কথায় এখনও মাছের হিসেব ওজনে নয়, হালিতে—গুনতি অথবা ভাগা হিসেবে। ইলিশ মাছ জোড়া—দু পয়সা এক পয়সা। এসব কথা যাঁরা শোনান তাঁদের অনেকেরই বয়েস ষাট থেকে সত্তরের মধ্যে। আর অনেক সময় কে কত সস্তা মাছ আর দুধ খেয়েছেন তার কেমন যেন এক অলিখিত প্রতিযোগিতা ভেসে ওঠে এদের কথোপকথনে।

বিয়ে, পৈতে, অন্নপ্রাশনের নেমন্তন্নে রুই-কাতলা খাওয়ানোর রেওয়াজ ছিল বাঙালি পরিবারগুলিতে। এখন ফিশ ফ্রাই, চিলি ফিশ; তন্দুরি ফিশ আসে ক্যাটারারদের দৌলতে। সেখানে স্যামন, ম্যাকরেল, ভেটকি। রুই-কাতলা বড় জোর এক পিস দু পিস। ভালো কালবাউশ, পরিচ্ছন্ন চাঁদা, লাল খলসে প্রায় দুষ্প্রাপ্য পাখি অথবা লুপ্ত-প্রায় বন্যপ্রাণী। মহাশোল মাছও তেমন করে নজরে পড়ে না।

গত কুড়ি পঁচিশ বছরে আমাদের ভোজন অভ্যাসে মিশে গেছে তেলাপিয়া, আমেরিকান রুই, পমফ্রেট, সিলভার কার্প। সার্ডিন মাছের নামটি আগে টিনড ফুডের সঙ্গেই জড়িয়ে থাকত। এর নাম জানতেন মুষ্টিমেয় নিউ মার্কেটে (হগ সাহেবের বাজার) যাওয়া বাঙালি আর অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানেরা। সার্ডিন এখন বাঙালির পরিচিত ডিশ।

বড় গলদা চিংড়ির মাথার ঘি-টি তারিয়ে খাওয়ার স্বাদ নতুন প্রজন্মের বাঙালির জিভে নেই। ভালো বাগদা চিংড়ির দেখাও তেমন মেলে কই? সম্প্রতি এলাহাবাদে কুম্ভ মেলায় গিয়ে একদিন হিউয়েট রোডের মাছের বাজারটিতে গেছিলাম। এটি এ শহরের সব চাইতে বড় মাছের বাজার। 32 টাকা কিলো দরে যে মাগুর ওখানে বিক্রি হচ্ছে আর যে আড় ট্যাংরার কিলো 28 টাকা, তা এখানে—এই কলকাতায় কিছুতেই 50 অথবা 40 টাকার কমে পাওয়া যাবে না। এলাহাবাদে বাঁশপাত্তি মাছ খাওয়ার স্মৃতি এখনও জিভে আছে।

বাঙালির মাছ-ভাত খাওয়া নিয়ে এলাহাবাদের অবাঙালিরা এখনও একটি ছড়া বলে—

"ধোতি পহনে ঢিলি ঢালি
ভাত উড়াওয়ে থালি থালি
সাড়ি মচ্ছি পিলপিলা ভাত
বাঙালি মারে লম্বা হাত।"

অর্থাৎ ঢিলেঢালা ধুতি পরা 'বাঙালি দাদা' পচা মাছ আর রোগা ভাত পেলেও লোভের হাত বাড়ায়। 'বাঙালি মচ্ছি ভাত খাতা'—এতো এখনও শোনা যায় হিন্দি বলয়ের অনেকের মানুষের মুখে।

গোয়াল ভরা গোরু, গোলা ভরা ধান, পুকুর ভরা মাছ—এসবই এখন বাঙালি জীবনের স্বপ্নে দেখা রূপকথা। তবু মাছ-ভাত আজও প্রায় সর্বস্তরের (অর্থনৈতিক বিন্যাসের কথা মনে রেখেই বলছি) বাঙালির মূল খাদ্য।

কৈ মাছের হরগৌরি, চিতলের মুইঠ্যা, ইলিশের পাতুরি, ভাপা ইলিশ, রুইয়ের কালিয়া, চিংড়ির মালাইকারি, পারশে-তপসে ভাজা, পাবদার ঝাল, আড় বেগুনের শুকত, সর্ষে বাটা দিয়ে মাখো মাখো বোয়াল, ফুলকপি দিয়ে ভেটকি, কৈ, মৌরলার অম্বল, বাটার পাতলা ঝোল, মূলো দিয়ে বড় শোল মাছ রান্না যাঁরা আবিষ্কার করেছিলেন, তাঁরা কি এই পৃথিবীর মানুষ ছিলেন? নাকি কোনো স্বর্গের বাসিন্দা? সন্দেহ জাগে।

অনেক বাঙালিই এখন রাতে রুটি খান। অনেকে মনে করেন এই গম ভোজনে হালফিল বাঙালি প্রজন্ম (ছেলে মেয়ে উভয়েই) একটু যেন বেশি লম্বা হয়ে যাচ্ছেন। মাছের বদলে প্রোটিনের যোগান দেয় ব্রয়লার চিকেন। চাউমিন, রোল, আর আরও নানান ধরনের ফাস্ট ফুড তার খাদ্য তালিকায়। তবু বাঙালি বাঁচে মাছে-ভাতে। আজও। বাঙালির এই পরমপ্রিয় খাদ্য নিয়েই কি হৈচৈ না হয়ে গেল কিছুদিন আগে! মাছের রোগ! জেলেদের জীবিকা তো বন্ধ হতে বসেছিল—সে কথা তোমরা সবাই জানো।

1A মুখার্জি পাড়া লেন, কলকাতা-700026

খুদে বৈজ্ঞানিক

— আগামী সংখ্যার পর —

দিলীপ দাস

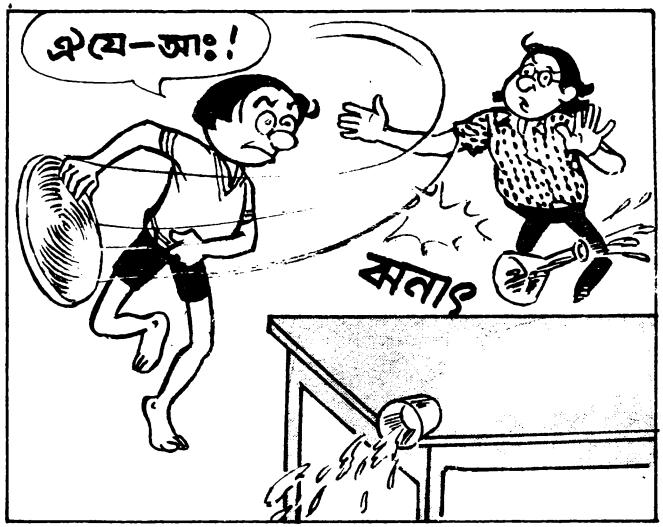

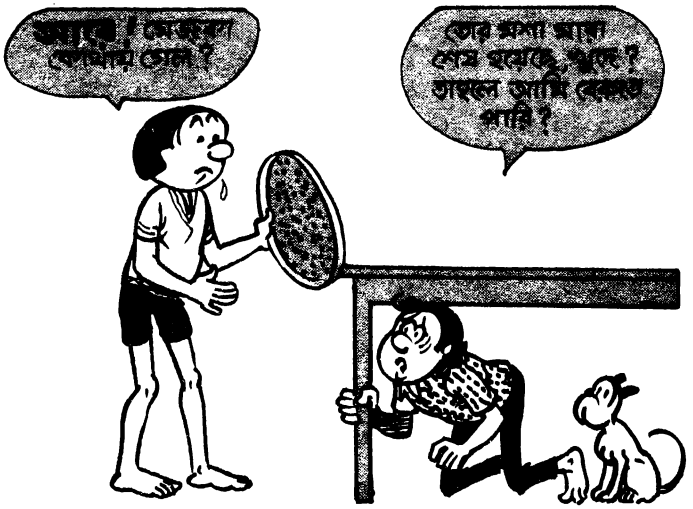

আমার গবেষণার সব সরঞ্জাম নষ্ট করছিস খুদে, সাবধান!
ইয়াঃ! আমি তো সাবধানেই করছি!
ঐ যে, আরও উড়ছে! মেজকা, একটু সরে দাঁড়াও।
টকাং
বাপস্!
সব ফিনিশ! দেখ মেজকা, তোমার শত্রু সব থালায়!
আরে! মেজকা কোথায় গেল?
তোর মশা মারা শেষ হয়েছে, খুদে? তাহলে আমি বেরোতে পারি?
মশার জন্যে তুমি শেষকালে টেবিলের নিচে ঢুকেছিলে?
জানোয়ার! মশার জন্যে নয়—তোর জন্যে! দ্যাখ, আমার মাথা কি করেছিস!
সরি। আমি দেখতে পাইনি! তবে থালাটা দেখ, ওদিকে ভনভনানিও অনেক কমিয়ে দিয়েছি।
তা কমেছে, তবে এই লম্ফঝম্প আমার মোটেই পছন্দ নয়।
আমারও পছন্দ নয়!

মেজকা, তোমার কী খুব লেগেছে?
নাঃ। তোর থালাটা দেখি।
মাথাটা কি খুব যন্ত্রণা করছে? একটু আরণিকা মাদার লাগিয়ে দেব?
নাপ্!
তাহলে?
তোমাট ফ্যাচ ফ্যাচ! এখন গেট্ আউট!
হুম্, এই জন্যই কারো উপকার করতে নেই! ঠিক আছে, পরে দেখে নেবো।
অকৃতজ্ঞ!
পরদিন
ক্রি-রি-রি-রি-ং-ং-ং
হ্যালো—
মেজকো—? যা-যা-যাচ্ছি!
দরজা খুলতেই ভয় লাগছে! কি দেখতে আবার কি দেখবো কে জানে!
র-র-র-র-র-র
ই-ই-ই-ইস! মেজকো এ সব কি হচ্ছে-থামাও!
এখন মশা মারতে স্প্রে করছে নাকি?

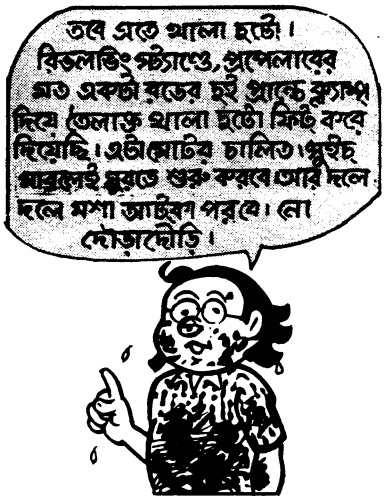

তোমার স্প্রে থামাও!
র-র-র-র
দুর, হতভাগা! স্প্রে কোথায়? এটা হল মসকুইটো কিলার!
এটা আবার কোথায় পেলে?
বুঝতে পারছিস না? তোর মশা মারার থালা। খালি একটু উন্নত বৈজ্ঞানিক কারিগরি ব্যবহার করেছি।
তবে এতে থালা দুটো। রিভলভিং স্ট্যান্ডে, প্রপেলারের মত একটা রডের দুই প্রান্তে ক্ল্যাম্প দিয়ে তেলাক্ত থালা দুটো ফিট করে দিয়েছি। এটা মোটর চালিত। সুইচ মারলেই ঘুরতে শুরু করবে আর দুলে দুলে মশা আছড়ে পরবে। নো দৌড়াদৌড়ি।
মেজকা তোমার জবাব নেই। কিন্তু তোমার তৈলাক্ত থালার তেলের ছিটেতে আমাদের সর্বাঙ্গ তৈলাক্ত করে তুলেছে—তার কি জবাব দেবে?
এ্যঃ হে!
আমি বাতলাচ্ছি। এক নাগাড়ে ঘোরার ফলে তেলটা থালার একদিকে সরে যায় এবং ছিটকে পড়তে থাকে। এখন মাঝে মাঝে থালাটা ঘুরিয়ে দিলে তেলটা আর সরার চান্স পাবে না এবং ছিটকোবে না।
বেড়ে বলেছিস তো! এই জন্যেই বলে, বুদ্ধি থাকলেই উপায় হয়।
মেজকা, নতুন কিছু করলেই তো লোকেরা প্রাইজ-ট্রাইজ কত কি পায়। আমরা-?
এই আবিষ্কার যদি দেশের কোনো উপকারে লাগে জানবি সেটাই বড় পুরস্কার।
উপস্! এদের আবিষ্কারের ঠেলায় শুধু আমি নয়, এবার দেশবাসীর প্রাণও খাঁচাছাড়া করে ছাড়বে দেখছি।

০ শেষ

ডাইনোসর বিচিত্রা

উদয়ন মুখার্জী

বিভিন্ন সায়েন্স ফিকশন বইতে সিনেমায় বা কার্টুন ছবিতে ডাইনোসরের ছবি দেখে তোমাদের মনে নিশ্চয়ই প্রশ্ন জেগেছে, "ডাইনোসর কি? তারা কোন্ যুগে বেঁচে ছিল? তারা কি খেত? কেনই বা তারা আজ বেঁচে নেই?" তাই না? আজ তোমাদের সেই সম্পর্কে একটু আভাস দেওয়ার চেষ্টা করছি।

আমরা যদি আজ থেকে 200 মিলিয়ন বছর পিছিয়ে যাই, তাহলে আমরা গিয়ে উপস্থিত হব এমন এক যুগে যাকে বলা হয় "সরীসৃপদের স্বর্ণযুগ" (golden age of reptiles) এই যুগকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়—(i) ট্রায়াসিক (Triassic) ii) জুরাসিক (Jurassic) এবং (iii) ক্রিটেসিয়াস (Creataceous).

এই স্বর্ণযুগেই অস্তিত্ব ছিল ডাইনেসোরদের। ডাইনোসররা পৃথিবীতে রাজত্ব করেছে প্রায় 135 মিলিয়ন বছর, যেখানে পৃথিবীতে রাজত্ব করে আসছে মাত্র 2 মিলিয়ন বছর ধরে।

সব ডাইনোসরই দেখতে দৈত্যাকার ছিল না যা সাধারণতঃ মনে করা হয়। সবচেয়ে ছোট আকারের ডাইনোসর কম্পসোগন্যাথাস (Compsognathus)-এর দৈর্ঘ্য ছিল মাত্র 30 সেন্টিমিটার। আর এর ওজন ছিল একটা ছোটখাটো মুরগীর-ওজনের প্রায় সমান।

ব্র্যাঙ্কিওসোরাস (Branchiosaurus)-এর উচ্চতা ছিল 12 মিটারের মত। অর্থাৎ সবচেয়ে উঁচু জিরাফের দ্বিগুণেরও বেশী লম্বা ছিল এটি। এর ওজন ছিল অকল্পনীয় প্রায় 50 টন, অর্থাৎ বারোটা বড় হাতীর ওজনের সমান।

এদের মধ্যে সবচেয়ে লম্বা ছিল ডিপ্লোডকাস (Diplodocus) কিন্তু এর ওজন ছিল মাত্র 11 টন। এর গলা ছিল খুব লম্বা এবং সেই অনুপাতে লেজটিও ছিল বেশ লম্বা। ডিপ্লোডকাস দৈর্ঘ্যে ছিল 29 মিটারের মত অর্থাৎ সাতটি ভারতীয় হাতীকে এক লাইনে দাঁড় করালে যতটা লম্বা হয় তার সমান।

টাইরানোসোরাস (Tyrannosaurus)-এর উচ্চতা ছিল 5 মিটার এবং ওজন ছিল 9 টন। তোমরা শুনে অবাক হবে যে, দৈত্যাকার ডাইনোসররা আকারে বর্তমানের তিমি অপেক্ষাও ছোট। নীল তিমি আয়তনে ব্র্যাঙ্কিওসোরাস-এর দ্বিগুণ এবং টাইরানোসোরাস-এর 16 গুণেরও বেশি।

দেহের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ডাইনোসরদের দেহে কোনো লোম বা পালক ছিল না; কিন্তু তাদের দেহের বিরাট আকার-ই দৈনিক তাপমাত্রার পরিবর্তন থেকে তাদের রক্ষা করত। যখন কোন প্রাণী ধীরে ধীরে বড় হয় তখন তাদের দেহতল, যার মাধ্যমে তাপ শোষিত বা নির্গত হয়, সমানুপাতে হ্রাস পেতে থাকে। তার ফলে দেহের তাপমাত্রার হেরফেরও খুব ধীরে ধীরে ঘটতে থাকে। সুতরাং তাপমাত্রার এই সামান্য পরিবর্তন তাদের দেহের উপরেও খুব কমই প্রভাব বিস্তার করে। এই নীতিকে কাজে লাগিয়েই ডাইনোসররা তাদের দেহের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করত।

আকার ও আয়তনের বিভিন্নতা অনুযায়ী বিভিন্ন ডাইনোসরের বাসস্থানও ছিল বিভিন্ন। টারডানোডন (Pterdanodon) নামে একরকম ডাইনোসর গ্লাইডার বিমানের মত আকাশে ভেসে বেড়াতে পারত। ব্রন্টোসোরাস (Brontosaurus) ও ব্র্যাঙ্কিওসোরাস-এর মত বিকটাকার ডাইনোসররা অধিকাংশ সময় জলেই থাকত। জলে থাকার ফলে তাদের দেহ ছিল হাল্কা। ইকথিওসোরাস (Ichthyosaurus) ও প্লিসিওসোরাস (Pleisiosaurus) প্রভৃতি ডাইনোসর সমুদ্রে বাস করত। স্টেগোসোরাস (Stegosaurus) টাইরানোসোরাস ট্রাইসেরাটপ্‌স (Triceratops) প্রভৃতি অন্যান্য ডাইনোসররা স্থলে বাস করত।

বিভিন্ন ডাইনোসেরের দাঁত পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, তাদের মধ্যে কেউ কেউ ছিল শাকভোজী, আবার কেউ কেউ ছিল মাংসাশী। টাইরানোসোরাস, ইকথিওসোরাস, প্লিসিওসোরাস, প্রভৃতি হিংস্র ডাইনোসররা ছিল মাংসাশী। আর ব্রন্টোসোরাস, ব্র্যাঙ্কিওসোরাস, স্টেগোসোরাস প্রভৃতি ছিল তৃণভোজী বা শাকাশী। আবার স্ট্রাথিওমিস (Struthiommics) এবং ওভিরেপটর (Oviraptor) খেত ডিম। ডিম বলতে অন্যান্য ডাইনোসর বা তৎকালীন অন্যান্য পাখী বা প্রাণীর ডিম।

মাংসাশী ডাইনোসরদের হাত থেকে আত্ম রক্ষা করার জন্য শাকাশী ডাইনোসরদের দেহে বিভিন্ন প্রকার আভযোজন

হয়েছিল। এদের মধ্যে কেউ কেউ যেমন—ব্র্যাঙ্কিও সোরাস তাদের বিরাট আকৃতির দ্বারা মাংসাশী ডাইনোসর-দের মনে ভীতি উৎপাদন করত। কোন কোন শাকাশী ডাইনোসর শত্রুর হাত থেকে বাঁচতে খুব দ্রুত দৌড়াতে পারত। কিছু কিছু শাকাশী ডাইনোসর আত্মরক্ষার জন্য দলবদ্ধ হয়ে বাস করত। অন্যানাদের দেহে ছিল বিভিন্ন রকম দুর্ভেদ্য বর্মের আবরণ। অ্যাঙ্কিলোসোরাস (Ankylasaurus)-এর দেহের দুদিকে ছিল এই রকম বর্মের আবরণ এবং তার লেজও ছিল বর্মের আবরণে আবৃত। স্কেলিডোসারাস (Scelidosaurus)-এর পিঠের উপরে এবং দেহের দুপাশে ছিল শক্ত হাড়ের ছোট ছোট কাঁটা। স্টেগোসোরাসের দেহে ছিল শক্ত হাড়ের পাতের আবরণ। এদের পিঠের উপরের দিকে ছিল কতকগুলি ছুঁচলো হাড়ের পাত এবং এগুলি ছিল খাড়াভাবে একসারিতে অবস্থিত। আর এদের লেজে দুই সারিতে সাজানো ছিল বড় বড় কাঁটা (অরণ্যদেবের গল্পে এর ছবি তোমরা নিশ্চয়ই দেখেছ)। ট্রাইসেরাটপ্‌স এর আত্মরক্ষার উপায় ছিল এর শক্ত হাড়ের কাঠামোয় তৈরী গলা এবং তাতে বড় বড় লোমের ঝালর।

অন্যান্য সরীসৃপদের মত ডাইনোসররাও ডিম পাড়ত। স্ত্রী ডাইনোসররা বালির মধ্যে গর্ত খুঁড়ে তাতে ডিম পাড়ত এবং তার পর বালি দিয়ে ঢেকে দিত। এই রকম বালির আবরণে আবৃত কিছু ডিম মঙ্গোলিয়াতে পাওয়া গেছে।

ডাইনোসররা আজ আর জীবিত নেই ; তারা সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হয়েছে। কিন্তু তাদের ধ্বংসের কারণ সম্বন্ধে আজও সঠিক ভাবে কিছু জানা যায়নি। কেউ কেউ এই মত পোষণ করেন যে, সূর্যরশ্মির বিকিরণের হঠাৎ অস্বাভাবিক বৃদ্ধিই এর জন্য দায়ী। অনেকের মতে পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রের দিক পরিবর্তনই এর কারণ। অনেকে বলেন যে, তৎকালীন বিভিন্ন উদ্ভিদের দেহে উৎপন্ন বিভিন্ন রকম উপক্ষার ডাইনোসরদের দেহে বিষক্রিয়া ঘটিয়ে তাদের অবলুপ্তি ঘটিয়েছে। কিন্তু এই মত কেবলমাত্র তৃণভোজী ডাইনো-সরদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। অন্যান্য ডাইনোসররা বিভিন্ন ব্যাকটিরিয়া-ঘটিত রোগের শিকার—এই মতও প্রচলিত। তবে সবচেয়ে বিশ্বাসযোগ্য যে মতটি প্রচলিত সেটি হল, প্রাকৃতিক কারণে বিভিন্ন মহাদেশের স্থান পরিবর্তনের ফলে পরিবেশ ও আবহাওয়া সংক্রান্ত যে প্রচণ্ড একটা পরিবর্তন সেই যুগে হয়েছিল, ডাইনোসররা তার সঙ্গে নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারে নি। এই বিরাট পরিবর্তনের হাত থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য তাদের দেহে কোন অন্তরকও ছিল না। উপরন্তু ক্রিটেসিয়াস যুগে তাপমাত্রার যে চরম পরিবর্তন ঘটেছিল তার সঙ্গেও তারা মানিয়ে নিতে পারে নি। এইসব কারণেই তারা অবলুপ্ত হয়েছে।

(National Museum of Natural History, New Delhi-র সৌজন্যে)

সুজনবাগান লেন, পোষ্ট—চিনসুরা, জেলা—হুগুলী।

গবেষণা

তুঁষ

সুখময় মাজী

ধান থেকে পাওয়া যায় তুঁষ। তুঁষকে আমরা অপ্রয়োজনীয় বস্তু হিসাবেই সবাই জানি, তাই এটা অন্যান্য গো-খাদ্যের সাথে গরুর পেটে যায়। কেউ কেউ আবার আগুন জ্বালানোর কাজে তুঁষ ব্যবহার করেন। কিন্তু দেখা গেছে আগুনে তুঁষ পোড়ে খুব সামান্যই। এর থেকে মাত্র 20%—30% তাপ পাওয়া যায়।

এই তুঁষকে কিভাবে মানুষের কাজে বেশী করে লাগানো যায় সে বিষয়ে পৃথক পৃথক ভাবে গবেষণা করেছেন, খড়্গপুর I.I.T ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের "Food Technology & Biochemical Engeneering" এর বিজ্ঞানীরা। খড়্গপুর I.I.T-র বিজ্ঞানীরা তুঁষকে চাপ দিয়ে এক ধরনের গুল তৈরীর পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন সে গুল থেকে প্রচুর পরিমাণে তাপ পাওয়া যাবে।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীদের প্রচেষ্টায় একটি অভিনব ফার্নেস তৈরী করা হয়েছে, যাতে তুঁষ সম্পূর্ণ ভাবে জ্বলে পুড়ে যাবে। এর থেকে প্রায় 100% তাপ পাওয়া যাবে। পড়ে থাকবে শুধুমাত্র সাদা ছাই। এই ছাই কিন্তু অদাহ্য তুষ থেকে একেবারেই মুক্ত এবং এতে প্রচুর পরিমাণে খাঁটি বালি থাকে যা সাধারণতঃ প্রকৃতিতে পাওয়া যায় না। তুঁষের এই সাদা ছাই-যে প্রায় 95% সিলিকা থাকে। সিলিকা থেকে তৈরী করা যাবে সোডিয়াম সিলিকেট। নিশ্চয়ই জানো সোডিয়াম সিলিকেট সাবান ও কাচ তৈরীতে কাজে লাগে। এ ছাড়াও এই সিলিকা থেকে আর একটা মূল্যবান দ্রব্য প্রস্তুত করা যাবে। সেটা হলো সিলিকন চিপ। সিলিকন চিপের নাম তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছ, আই. সি. তৈরীতে কাজে লাগে। তুঁষের ছাই থেকে প্রাপ্ত ও উন্নত-মানের সিলিকা থেকে পাওয়া যাবে সিলিকন চিপ তৈরির সিলিকন।

কেন্দুয়া ডিহি, বাঁকুড়া।

কালি আবিষ্কারের কাহিনী

রতন চন্দ্র ঘোষ

কালি আবিষ্কারের কাহিনী লিখতে গিয়ে শুরুতেই পড়লাম বড় ফ্যাসাদে। প্রথমে তো পেনটাই খুঁজে পাচ্ছিলাম না। তারপর যখন খুঁজে পেয়ে লিখতে গেলাম, দেখি কলমে আবার কালি নাই। কি ঝামেলা রে বাবা।

কালির দোয়াত খুঁজছি এমন সময় আমার ছোট্ট ভাগ্নী নাম অবশ্য বুড়ী, প্রশ্ন করে, 'মামা কালি কি ? কবে তৈরী হয় ?'

সত্যিই তো ব্যাপারটা জানার মতই। সভ্যতার উদয় লগ্নে মানুষ তো কালির ব্যবহার জানতোই না। জানবে কি ? তখন কি কালির আবিষ্কার হয়েছে নাকি। তখন তো মানুষের চিন্তাধারা মানুষের মুখে মুখে চলে বেড়াত। গুরুগৃহে শিষ্যরা গুরুর মুখে শুনে শুনেই অধ্যয়ন করতো। তখন জ্ঞানের মাধ্যম ছিল শ্রুতি।

তারপর মানুষ লিখতে শিখে শিলায় শিলায় লিপিবদ্ধ করে গড়ে তুললো শিলালিপি। পর্বত গাত্রে, গুহায় লিখে লিখে নিজেদের চিন্তার ভাবধারা লিপিবদ্ধ করতে লাগলো। এরও অনেক অনেক দিন পর এল কালির ব্যবহার।

কালির কথা বলতে গেলে বলতে হয়, মিশর দেশের লোকেরাই প্রথম কালির ব্যবহার শিখেছিল। ঐতিহাসিকদের মতে একমাত্র মিশরেই নাকি প্যাপিরাসের ওপর লেখা সব চাইতে পুরানো কালির ব্যবহারের নিদর্শন রয়েছে।

বর্তমান কালের বৈজ্ঞানিকরা পুরানো কালি নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখেছেন যে প্রাচীন কালির প্রধান উপাদান ছিল কার্বন অর্থাৎ অঙ্গার। কালি বিশেষজ্ঞদের মতে প্রাচীন কালিতে থাকতো ভুষোকালি আর গঁদ। এ দুটো বস্তু মিশিয়ে হত আদ্যিকালের কালি।

আজকের দিনে যে চাইনীজ ইঙ্ক আমরা বাজারে দেখতে পাই তাও অতি প্রাচীন কালি। আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব 2597 সালে এ কালির আবিষ্কার হয়েছিল। এরও প্রধান উপাদান কার্বন বা অঙ্গার। সব থেকে মজার কথা হল বর্তমানে সাধারণত আমরা লেখার কাজে যে কালি ব্যবহার করে থাকি তার সাথে পুরানো দিনের কালির কোন মিল নাই। বর্তমান কালে সাধারণ লেখার কালির প্রধান উপাদান দুটি (1) গলট্যানিক অ্যাসিড (2) ফেরাস সালফেট। এই ফেরাস সালফেট আর কিছুই নয় লৌহ ঘটিত লবণ। আর গলট্যানিক অ্যাসিড পাওয়া যায় আমলকী, হরিতকী, বহেড়া এই ত্রিফলা থেকে। কিন্তু সবথেকে বেশী এবং প্রচুর পরিমাণে ট্যানিক অ্যাসিড থাকে মাজফল বা গলনাটে। অবশ্য এই গলনাট আমাদের দেশে পাওয়া যায় না। ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে ওক নামে এক ধরণের গাছ আছে, সেই গাছে 'গল ওয়াসপ' নামে এক ধরণের পোকা লাগে। এই পোকারা আবার ওক পাতায় ডিম পাড়ে। ফলে পাতার শিরাগুলো যায় নষ্ট হয়ে। সৃষ্টি করে ক্ষত। সেই ক্ষত থেকে এক ধরণের রস বের হতে থাকে। তারপর এই রস জমে জমে সৃষ্টি হয় গলনাটের। গলনাটকে ভালো করে গুঁড়ো করে অ্যালকোহলের সঙ্গে ভালোভাবে ফোটালেই পাওয়া যাবে গলট্যানিক অ্যাসিড।

এরপর প্রথমে চাই গলট্যানিক অ্যাসিড, তারপর তাতে মেশাতে হবে ফোরাস সালফেট, সালফিউরিক অ্যাসিড, গঁদ ও ফেনল। আর মেশাতে হয় রং।

কালি তৈরী হলো, এবার কাগজে লেখার পর্ব। কালি কি করে তাড়াতাড়ি শুকাবে ? তারও ব্যবস্থা বৈজ্ঞানিকরা রেখেছেন। কালির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে হবে পরিমাণ মতো স্পিরিট। ব্যস্ তৈরি হয়ে যাবে কালি।

গ্রাম+পোঃ—কেশবপুর, হুগলী।

সন্ন্যাসী বৈজ্ঞানিক

সুব্রত দাস

গৈরিক বসনধারী নন। অথচ মনে প্রাণে পোষাকে আশাকে ছিলেন খাঁটী সন্ন্যাসী। বিভাগের পূর্বে পুন্যভূমি ভারত মাতার ক্রোড়ে জন্ম নিয়েছিলেন এই সন্ন্যাসী বৈজ্ঞানিক।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের কৃতী ছাত্র। আত্মভোলা, উদারচেতা গবেষক আভিজাত্যের বেশভূষা ত্যাগ করে মাটির টানে আকৃষ্ট হয়ে পর্যবেক্ষণ আর বিজ্ঞান-বীক্ষণাগারে গবেষণা করে মাটি হতে সংগ্রহ করেছিলেন সার। আজীবন তিনি ছিলেন মাটির একান্ত কাছের মানুষ। অকৃত্রিম প্রেম নিষ্ঠা আর মমত্বভরা অনুভূতি নিয়ে গবেষণায় মশগুল থাকতেন এই প্রখ্যাত রসায়নবিদ্। তিনি যে একজন বৈজ্ঞানিক এ সংজ্ঞা ছিল তাঁর সম্পূর্ণরূপে অজানা। এই অমিতধর বৈজ্ঞানিক হলেন ডঃ নীলরতন ধর। দোসরা জানুয়ারী, 1892 সালে যশোহর শহরে জন্ম হয়। পিতা প্রসন্ন কুমার ধর ছিলেন একজন খ্যাতনামা উকিল।

বাল্যকালে তিনি গবেষণামূলক বই পড়তে ভাল বাসতেন। যশোহর জেলা স্কুল হতে তিনি এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উচ্চস্থান লাভ করেন (1907)। ইণ্টার মিডিয়েট এ প্রথম বিভাগে উচ্চস্থান (1909)। প্রেসিডেন্সী কলেজে বি. এস. সি ও এম. এস. সি পাঠ করেন। শিক্ষা গ্রহণ কালে ডঃ মেঘনাদ সাহা, স্যার জ্ঞানেন্দ্র নাথ ঘোষ ও ডঃ জ্ঞানেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়ের হতে তিনি দুই ক্লাস উঁচুতে অধ্যয়ন করতেন।

1913 সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভৌত রসায়নের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। বহুবিধ পদ, পদক, সম্মানজনিত অগনিত পুরস্কার ও উপাধিতে তিনি ছিলেন ভুষিত। রাষ্ট্র-গুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে তিনি ইংরাজী ভাষা এবং রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ও গঙ্গাধর মুখোপাধ্যায়ের কাছে এই সন্ন্যাসী বিজ্ঞানী বিজ্ঞান অধ্যয়ন করতেন।

স্বাক্ষর

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় তাঁর আত্মজীবনীতে ও স্যার শান্তি স্বরূপ ভাটনগর ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতি তাঁর ভাষণে বলেছিলেন ডঃ নীলরতন ধরই ভারতবর্ষে ফিজিকো কেমিক্যাল গবেষণার প্রবর্তক।

'শীলা ধর গবেষণাগার' তাঁরই দানে তৈরি। এই সমগ্র গবেষণা মূলক প্রতিষ্ঠানটি তিনি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করে গিয়েছেন। যশোহর মধুসূদন কলেজে, ন্যাশনাল আকাদেমী অফ সায়েন্স, ইণ্ডিয়ান কেমিক্যাল সোসাইটীতে চিত্তরঞ্জন সেবাসদনে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্যার প্রফুল্ল চন্দ্র রায় অধ্যাপক পদের জন্য তিনি তাঁর অর্জিত অর্থ দান করে দেশবাসীর শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন।

সারা জীবন গবেষণা আর বিজ্ঞানের সেবার মধ্য দিয়ে তিনি মনে করতেন—'বিজ্ঞানের সেবা, মানুষের উপকার করা আর সর্ব সাধারণের মধ্যে বিজ্ঞান প্রচার করাই বৈজ্ঞানিকের ধর্ম্ম।'

64/1, 'বি', রোড বামনগাছি, শালিকিয়া, হাওড়া।

॥ পাঁচ ॥

শোবার ঘরে আয়নার সামনে বসেছিল করবী। ঘরে ঢুকে সুবীর অবাক হ'য়ে তার দিকে তাকিয়ে বললে, 'খাবার ঘরে ব্রেকফাস্ট তৈরি, আর তুমি, কিনা আয়নার সামনে ব'সে সময় নষ্ট করছ।'

'সময় নষ্ট করছি না তো।' আয়নার মধ্যে নিজের প্রতিবিম্বকে খুব মন দিয়ে দেখতে দেখতে করবী বললে, দেখছিলাম...

কি দেখছিলে ?

'নিজেকে।'

'নিজেকে তো রোজই দেখছ। আজ হঠাৎ এমন মন দিয়ে দেখার কি হয়েছে।'

আমার গালে ও গলায় কালো দাগ পড়েছে। কিসের দাগ বোঝার চেষ্টা করছি।

'রাত্রে বনমানুষটা তোমার গায়ে হাত দিয়েছিল তারই হাতের ছাপ নয়তো ?'

'ঠিক বলেছ, ঐ বনমানুষেরই হাতের ছাপ। কিন্তু রীতিমত সুগন্ধি।'

'তার মানে ?'

'স্নো, ক্রিম বা পাউডার কিছুই মাখিনি, তবু একটা চমৎকার গন্ধ নাকে আসছে। মনে হচ্ছে বনমানুষের দেওয়া তার হাতের ছাপ থেকেই এই গন্ধটা আসছে।

সুবীর কাছে এসে বললে, 'ঠিক বলেছ, তোমার গাল ও গলা থেকেই সুগন্ধটা আসছে। তোমার কাছে আসার আগে বনমানুষটা বোধ হয় ফুল ফল ঘেঁটেছিল...'

'মন বলে চিনি চিনি যে গন্ধ এর সমীরে।' মৃদু হেসে করবী বললে, 'গন্ধটা চেনা চেনা মনে হচ্ছে। বোর্ণিওর বেরী গাছের তলায় দাঁড়িয়ে পেয়েছি এ গন্ধ...

'গাছটার ডালপালা ভেঙ্গে ঝুলে আছে দেখলাম। মনে হচ্ছে ঐ বনমানুষটারই কীর্তি। গাছের ফল ফুলও খেয়েছে...'

'এ গন্ধ ফুলের গন্ধ। এইপ্ এ্যাণ্ড মান্‌কি পার্কের কৃষ্ণরাওয়ের হেফাজতে ডক্টর হার্ট্‌জের যে ওরাং ওটাং আছে, এ হয়তো তারই কীর্তি।'

তার নয়, অন্য কোন ওরাং ওটাংয়ের কীর্তি। একটু আগে কৃষ্ণরাওকে টেলিফোন করে জানলাম, ডক্টর হার্ট্‌জের ওরাং ওটাং তাঁর ঘরে তাঁর কাছে আছে। গতকাল সন্ধ্যায় তিনি কন্যাকুমারী থেকে এসেছেন এখানে।'

'অন্য ওরাং ওটাং এল কোথা থেকে ?' করবী বললে, 'এ তল্লাটে তা হ'লে আরও ওরাং ওটাং আছে।'

'যেখান থেকেই আসুক, কৃষ্ণরাও তার দায়িত্ব নেবেন বলেছেন !' সুবীর বললে, একটু বাদেই তাঁর পার্ক থেকে লোক আসবে ওকে ধরবার জন্য। খাবার ঘরে এস, তাড়াতাড়ি, ব্রেকফাস্ট সেরে লোকটার জন্য অপেক্ষা করি...'

ব্রেকফাস্ট সেরে ওরা ল্যাবরেটারিতে এল। করবী বললে, অপেক্ষা তুমিই কর, আমি আমার ঘরে গিয়ে আমার মাইক্রোস্কোপে, পুরুষোত্তমের ডেড্ বডি থেকে তোলা স্লাইড্‌গুলো দেখি।'

'তোমার ঐ ছোট মাইক্রোস্কোপে কি দেখবে !' সুবীর বললে, এখানকার মাইক্রোস্কোপে তো সব কটা স্লাইড্ ভাল করে দেখেই নিয়েছ !

মৃদু হেসে করবী বললে, 'বড় মাইক্রোস্কোপে যা দেখা যায় নি, ছোটটিতে হয়তো তা দেখতে পাব। ওটা তো আমারই মাইক্রোস্কোপ, তোমার মাইক্রোস্কোপ যা দেখায় নি ও হয়তো তা দেখিয়ে দেবে আমাকে।'

স্লাইডের বাক্সটা করবীর দিকে এগিয়ে দিয়ে সুবীর বললে, 'ঠিক আছে, নিয়ে যাও স্লাইড্‌গুলো। দেখা যাক, তোমার বন্ধু—মাইক্রোস্কোপ নতুন কি দেখায় তোমাকে।'

'পুরো বাক্সটি দিচ্ছ কেন, এর থেকে কয়েকটি বেছে নেব আমি। যেগুলোতে বেশি রক্ত, সেগুলো নেব আমি।

'বেশি রক্তের ওপরে তোমার পক্ষপাতের কারণ ?'

'বেশি রক্তে বেশি স্পোর আছে ব'লে মনে হচ্ছে...'

বলে স্লাইডের বাক্স খুলে স্লাইড্ বাছতে থাকে করবী। কয়েকটা স্লাইড সে একটি কার্ডবোর্ডের বাক্সে পুরে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

খানিকক্ষণ বাদে ঘরে ঢুকলেন ডক্টর হান্‌জ্ হার্ট্‌জ্। তাঁর দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে সুবীর বলল, 'ডক্টর হার্ট্‌জ্, আপনি!

'হ্যাঁ আমি। ডক্টর হার্ট্‌জ্ জবাব দিলেন, 'কৃষ্ণরাও পাঠিয়ে দিয়েছে আমাকে তোমাদের বাগানের বন মানুষটাকে ধরে ফেলার জন্য।'

'আপনি বনমানুষটাকে ধরবেন।' সুবীরের চোখ দুটি বিস্ফারিত হয়ে ওঠে: 'রীতিমত হিংস্র জানোয়ার! ও আমাদের দারোয়ান ও মালিকে মেরে অজ্ঞান ক'রে দিয়েছে!'

'যতই হিংস্র হোক আমার কাছে এলে হিংসা ভুলে যাবে। বন মানুষদের বশ করার কৌশল আমার জানা আছে। আমার পোষা ওরাং ওটাংকে কৃষ্ণ রাওয়ের পার্কে রেখেছি, তাকে আমি বোর্নিওর জঙ্গলে ধরেছিলাম বছর খানেক আগে। ওখানে আমি ওরাং ওটাংদের স্বভাব হাব-ভাব আচরণ নিয়ে গবেষণা করছিলাম।'

'তা হ'লে চলুন, বাগানের মধ্যে ওকে খুঁজে বের করি। বাগানের মধ্যে কোথায় লুকিয়ে আছে বুঝতে পারছি না...'

'ঘাবড়াবার কিছু নেই, আমি ঠিক খুঁজে বের করব ওকে। ওকে ধরার আগে আমি তোমার স্লাইড্‌গুলো দেখতে চাই।'

'বেশ তো,' দেখুন। কিন্তু আমার এই মাইক্রোস্কোপে স্পোরগুলো তেমন স্পষ্ট হ'য়ে উঠছে না। ব্যাঙ্গালোরের গবেষণাকেন্দ্রে বড় মাইক্রোস্কোপ থাকলেও তার মধ্য দিয়ে এই স্পোরগুলোর বিন্যাস তেমন প্রকট হয়নি। সেজন্যই আমরা আপনার মাইক্রোস্কোপ দিয়ে এই স্পোরগুলো পরীক্ষা করতে চেয়েছিলাম....'

'তার জন্য আরও একটু অপেক্ষা করতে হ'বে তোমাদের। জানোই তো হীরে দিয়ে তার লেন্‌স্ তৈরি করেছি। হীরে ঘষে তাকে লেন্‌সের আকার দিতে সময় লাগবে। ইতিমধ্যে তোমাদের মাইক্রোস্কোপের মধ্য দিয়ে দেখা যাক...'

বলে স্লাইডের বাক্সের দিকে হাত বাড়ালেন ডক্টর হার্ট্‌জ্।

সুবীর বললে, 'এগুলো কিসের স্লাইড' তা তো আপনাকে টেলিফোনেই জানিয়েছিলাম। পুরুষোত্তম প্যাটেলের মৃতদেহের ক্ষতচিহ্নগুলোর ওপরে যে রক্তমাখানো ধুলো ছিল তা-ই আমরা স্লাইডের গায়ে টেনে নিয়েছি। মাইক্রোস্কোপের মধ্যে ধুলো থাকে নি, স্পোর-এর আকার নিয়েছে। এই স্পোর চিনতে পারলে খুনী কোথাকার লোক তা' বুঝতে পারব।'

ডক্টর হার্ট্‌জ্ বললেন, এই স্লাইডগুলোতে যে স্পোর আছে, তা তোমার আমার শরীরেও লেগে থাকতে পারে। বাতাসে খুব সূক্ষ্ম ধুলোর সঙ্গে মিশে ভেসে বেড়ায় রকমারি স্পোর, মাদ্রাজ সুদ্ধ সকলের গায়েই তা পাওয়া যেতে পারে। পুরুষোত্তম প্যাটেলের শরীরের ক্ষতস্থান থেকে স্লাইড্-এ যা উঠে এসেছে তা খুনীর হাত থেকে এলেও এ অঞ্চলের যে কোনও মানুষের গায়ে পাওয়া যেতে পারে। অতএব এই স্পোর থেকে খুনীকে চিনে নেওয়া সম্ভব না-ও হ'তে পারে।'

এমন সময় হঠাৎ একটা আর্তনাদ শোনা গেল। ল্যাবো-রেটারির একজন গবেষণা কর্মীর গলার স্বর।

'কি হল!' ব'লে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে উদ্যত হয়েছে সুবীর, এমন সময় ঘরে ঢুকল একটি বনমানুষ। তাকে দেখে ওরাং ওটাং বলেই মনে হল তার।

'এটাই তো সেই ওরাং-ওটাং।' সুবীর উত্তেজিত স্বরে বললে।

'হ্যাঁ।' ডক্টর হার্ট্‌জ বললে, 'ঘরের মধ্যে ঢুকে ও আমার কাজ সহজ ক'রে দিয়েছে, সহজেই ওকে ধ'রে ফেলতে পারব। এস সুবীর আমাকে সাহায্য কর...'

কিন্তু ওরাং-ওটাংটাকে ধরার আগেই সে টেবিলে ছড়ানো ফাঁকা স্লাইডগুলোকে এলোমেলো করে দেয় এবং স্লাইডের বাক্সটিকে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

ডক্টর হার্ট্‌জ্ ওকে অনুসরণ করে বেরিয়ে আসেন ঘর থেকে, ওকে ধ'রে ফেলার জন্য দৌড়তে শুরু করেন। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই ওরাং-ওটাং এবং ডক্টর হার্ট্‌জ্ দুজনেই উধাও হ'য়ে যান বাগানের মধ্যে।

ডক্টর হার্ট্‌জ্ প্রস্থান করতেই ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলেন ভেঙ্কট রাজন।

'কি ব্যাপার ডক্টর সিন্‌হা? ভেঙ্কটরাজন বললেন, 'আপনার ল্যাবোরেটারিতে কিসের এত দাপাদাপি ও হাঁকাহাঁকি?'

'ওরাং ওটাং দাপাদাপি করে বেড়াচ্ছে। সুবীর জবাব দিল, স্লাইডগুলো নিয়ে চলে গিয়েছে...'

'বলেন কি!' আপনার ইন্‌ভেস্টিগেশন তা হলে বানচাল হয়ে গেল। স্লাইড্‌গুলোর মধ্যে খুনীর হদিস পাবার আশা রেখেছিলেন না আপনি?'

'তা রেখেছিলাম।' সুবীর ম্লান হেসে বললে।

'সে আশা তা হলে নির্মূল হয়ে গেল।'

'আশা নির্মূল হবে কেন? কথায় বলে, যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ...'

'শুনুন ডক্টর সিন্‌হা, স্লাইডগুলো আপনার বৈজ্ঞানিক

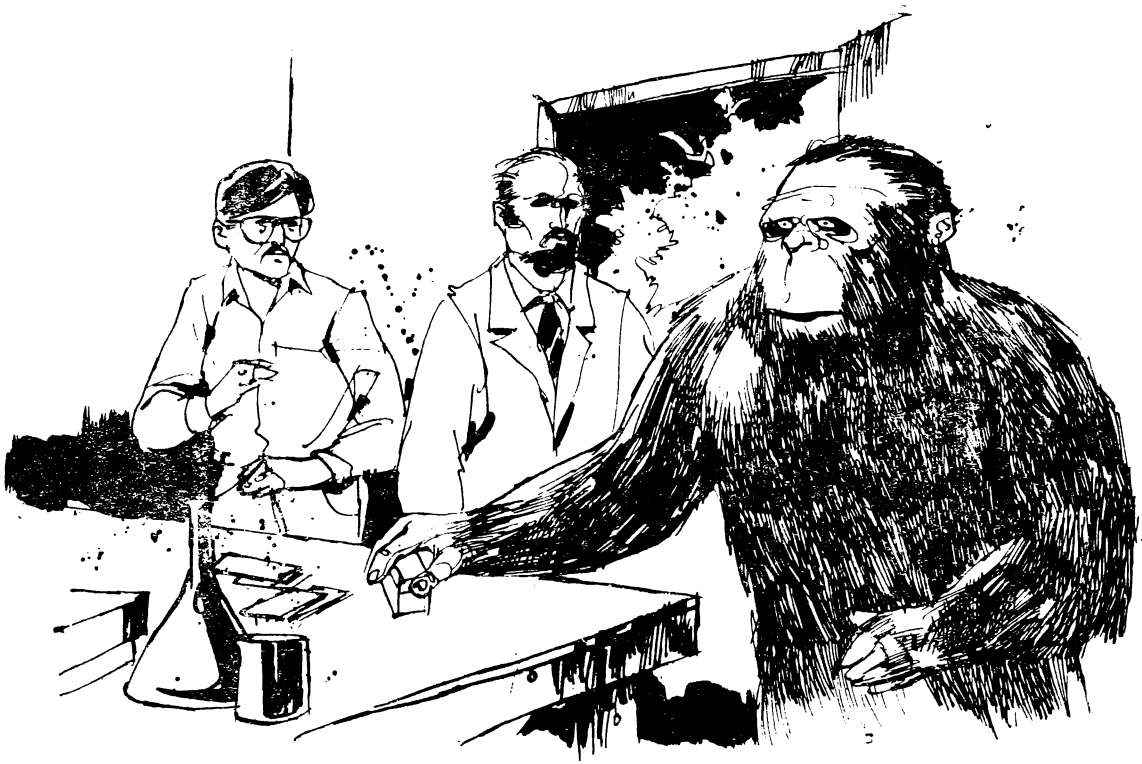

স্লাইডের বাক্সটিকে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়……

কৌতূহল মেটালেও খুনীকে খুঁজে পাবার ব্যাপারে ওগুলোর প্রয়োজন আর নেই। কারণ খুনী যে নৃসিংহ অবতার ছাড়া আর কেউ নয় তার অকাট্য প্রমাণ পেয়ে গিয়েছি আমি। বুঝলেন ডক্টর সিন্‌হা, যে ক্ষুর দিয়ে পুরুষোত্তমকে হত্যা হয়, তা পুরুষোত্তমের নয়, নৃসিংহ অবতারের। ক্ষুরের গায়ে তার হাতের ছাপ আছে।'

'ক্ষুরটা যে নরসিংহমূর্তির, তার প্রমাণ কি?' সুবীর প্রশ্ন করে।

'নরসিংহমূর্তি নিজেই বলেছে আমাকে। তাকে সামান্য একটু জেরা করতেই সে বলেছে যে ক্ষুরটা তার। ক্ষুর যখন তার, তখন ধরে নিতে পারি যে সে-ই খুন করেছে।'

'এমন কি হতে পারে না যে নরসিংহমূর্তির ক্ষুর দিয়ে খুন করেছে হত্যাকারী।'

নৃসিংহ অবতার অবশ্য সে কথাই বলছে। সে বলছে যে তার দাড়ি কামাবার সরঞ্জাম পুরুষোত্তমের ঘরে ড্রেসিং টেবিলে রেখে দিয়েছিল সে।'

'সত্যিই তা' ড্রেসিং টেবিলে রাখা ছিল কিনা তা কি আপনি দেখেছিলেন?

'না।'

'আমিও দেখিনি। অতএব নরসিংহমূর্তিকে বেনিফিট অব ডাউট্ (benifit of doubt) দিতে হয়। তার ক্ষুর দিয়ে কারুর খুন করাটা অসম্ভব কিছু নয়।'

'আপনি যাই বলুন, খুনী ঐ নৃসিংহ অবতার। বনমানুষটা আপনার স্লাইডগুলো নিয়ে পালিয়েছে, কাজেই ওগুলো পরীক্ষা করে খুনীকে সনাক্ত করতে আর পারবেন না আপনি, নৃসিংহ অবতার যে খুনী নয় তা প্রমাণ করতেও পারবেন না।'

'পারব।' কারণ বনমানুষটা স্লাইডের বাক্সটা নিয়ে পালিয়ে গেলেও করবীর কাছে আছে কয়েকটা স্লাইড। ডক্টর হার্ট্‌জের মাইক্রোস্কোপটা তৈরি হোক্, তারপর কন্যা-কুমারী গিয়ে—

এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকল ল্যাবোরেটারির আপ্পাইয়া, তাকে দেখে সুবীরের মুখের কথা মুখে থেকে যায়। হাঁপাতে হাঁপাতে আপ্পাইয়া বললে, 'ডক্টর হার্ট্‌জ বাগানের মধ্যে অজ্ঞান হ'য়ে পড়ে আছেন, বনমানুষটা তাঁকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে পালিয়েছে। শিগ্‌গির চলুন স্যার—'

(চলবে)

মানব ও দানব

সুব্রত মুখোপাধ্যায়

বিকেলের আড্ডায় কথা প্রসঙ্গেই খবরটা বললাম। অধ্যাপক বোধহয় একটু অন্যমনস্ক ছিলেন তাই জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি বললে রাহুল ?'

অধ্যাপক বোধিসত্ত্ব মুখোপাধ্যায়ের মত মানুষ আমার নামটা মনে রেখেছেন দেখে গর্ব হল, বললাম সংবাদ সংস্থা তানযুগের খবর অনুযায়ী গত আট বছর জাপানে দশজন বিজ্ঞানী মারা গেছেন রোবটের হাতে, সুইচ অফ করা অবস্থাতেই নাকি হঠাৎ জীবন্ত হয়ে উঠে আক্রমণ চালিয়েছে রোবটগুলো।

গাম্ভীর্য অধ্যাপক বোধিসত্ত্বের চেহারায় একটা আলাদা মাত্রা যোগ করেছে। গাম্ভীর্য সত্ত্বেও তিনি মিশতে জানেন। প্রায় পৌনে ছ'ফুট উচ্চতার অধ্যাপকের মাথায় এক বিশাল টাক, ফ্রেঞ্চ কাট দাড়ি, কতকটা লেনিন লেনিন চেহারা।

কথাটা মন দিয়ে শুনে কিছুক্ষণ কি যেন ভাবলেন অধ্যাপক, তার পর বোমা ফাটালেন 'মহাকাল'-এর ড্রয়িংরুমে, অন্তত একজন ভারতীয় বিজ্ঞানীও প্রাণ হারিয়েছেন রোবটের হাতে যখন সুইচ ছিল অফ করা। আর একজন বিজ্ঞানীও সেই রাতেই মারা যেতেন, কিন্তু তা হলে আজ এই বোধিসত্ত্ব মুখুজ্যেকে তোমরা এখানে দেখতে পেতে না।

চারদিকে তাকালাম, সুজিত উজ্জ্বল বা অচিন্ত্যরা চুপচাপ তাকিয়ে আছে অধ্যাপকের দিকে, সৌভাগ্যবান সেই বিজ্ঞানী তাহলে বোধিসত্ত্ববাবু ! কোন সাংবাদিক উপস্থিত থাকলে খবরটা ছুপ হতে পারতো।

আমাদের দিক থেকে সম্ভাব্য প্রশ্নটা প্রথমেই ছুঁড়ে দিল 'চণ্ডল, ব্যাপারটা ঠিক কি হয়েছিল ?'

ঠিক বেঠিক জানিনা, তবে যা দেখেছিলাম তাই বলছি।' অধ্যাপক পাইপটায় অগ্নিসংযোগ করলেন।

আমি তখন এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাণীতত্ত্বের অধ্যাপক। একদিন আমি আর আমার বিভাগীয় প্রধান ডঃ ম্যাকফারলন ভাবলাম ইয়েতিদের ওপর একটা গবেষণা করলে কেমন হয়।

ঠিক হল গবেষণা করব কিন্তু তা হিমালয়ের বুকে থেকে। এটাকে তাই গবেষণা-কাম-অভিযান বলা যেতে পারে। সেজন্য প্রথম দরকার হিমালয়ের দুর্গমস্থানে একটা মোটামুটি ঘর। উপযুক্ত পরিকল্পনা তৈরী করলাম। উন্নত এক জাতের প্লাস্টিকের ব্যবহার ঠিক হল। খাবার দাবার সংগ্রহের কোন অসুবিধা নেই, একটা লোক ঠিক করে নেব, সেই প্রয়োজনমত বিস্কুট, কনডেনসড মিল্ক, চকোলেট জল ইত্যাদি পৌঁছে দেবে।

কিন্তু অসুবিধা দেখা দিল একটা জায়গায় ; যখন বরফ

পড়ে ঘর চাপা পড়ে যাবে তখন কি হবে? আর যদি হঠাৎই ঘরটা ভেঙে যায় তখনই বা কি হবে, তাছাড়া আমাদের যন্ত্রপাতি গুলো যদি দুর্গমতম কোন জায়গায় বসানোর প্রয়োজন হয় তখনই বা কি হবে? ভাবলাম একটা রোবট সঙ্গে নিলে কেমন হয়!

ম্যাকফারলনের সঙ্গে আলোচনা করে ঠিক করলাম আমার বন্ধু বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সায়েন্সের অধ্যাপক উমাশঙ্কর অধিকারীকে এ ব্যাপারে বলব। কোন্ একটা ইণ্ডিয়ান ম্যাগাজিনে পড়েছিলাম অধ্যাপক অধিকারী নাকি রোবট তৈরির চেষ্টা করেছেন। তাছাড়া আমরা চাইছিলাম না আমাদের গবেষণার কথা পাঁচ কান হোক, তাই চাইছিলাম রোবট নিলে পরিচিত লোকের থেকেই নেব।

সমস্ত কিছু জানিয়ে অধ্যাপক অধিকারীকে চিঠি দিলাম। উত্তর পেলাম তার মাস খানেক পরে। অধ্যাপক অধিকারী আমাকে বারাণসী আসতে বলেছিলেন।

ম্যাকফারলন আর আমি তারপরই চলে এলাম বারাণসীতে। গাছপালা ঘেরা শান্ত পরিবেশ, গঙ্গার ধারে উমাশঙ্কর বাবুর বাংলো। উমাশঙ্করবাবু অকৃতদার, তাই বাড়িতে সঙ্গী বলতে জগন্নাথ, ওঁর কাজের লোক আর একটা অ্যালসেসিয়ান কুকুর।

বাড়িতে পৌঁছতেই অধ্যাপক অধিকারী গঙ্গার দিকের একটা ঘরে আমাদের থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন। বললেন যে, পরের দিন সকাল বেলা আমাদের রোবটটা দেখাবেন।

সারারাত অনেক কষ্টে কাটালাম, রোবটটা না দেখা পর্যন্ত শান্তি নেই, সকালবেলা জগন্নাথ আমাদের ডাকতে এল, আমরা তৈরি ছিলাম।

ড্রয়িংরুমটা বেশ সাজানো-গোছানো, সর্বত্রই পরিচ্ছন্নতার পরশ। ব্রেক-ফাস্ট করে গেলাম অধ্যাপকের ল্যাবরেটরীতে। নিচের তলায় বড় একটা ঘরে তার ল্যাবরেটরী, বিভিন্ন রকম ছোটখাটো যন্ত্রপাতি, সব কিছুর কার্যকলাপ আমার মত জীববিজ্ঞানীর পক্ষে জানা সম্ভব নয়।

রোবটটা দেখলাম, দেয়াল ঘেঁষে রাখা একটা চেয়ারের ওপর বসে আছে রাজকীয় ভঙ্গীতে। লম্বায় ফুট চারেক হবে। এক বিশেষ ধরণের ফাইবারে ভেতরের যন্ত্রপাতি গুলো ঢাকা। দেখতে অবিকল চন্দ্রপৃষ্ঠে মানুষকে যে রকম দেখতে হয় তার মত। পিঠে একটা প্লাগ, তার সাহায্যে রোবটের ব্যাটারিটি চার্জ দেওয়া হয়; নির্দেশ গ্রহণের জন্য মাথায় ছোটছোট কতকগুলো বোতাম, পিঠে লেখা ঃ— U. S. A—2.

লেখাটা ভালো করে দেখে ম্যাকফারলন জিজ্ঞাসা করলেন, এর যন্ত্রপাতি কি স্টেটস্ থেকে এনেছেন?'

অধ্যাপক অধিকারী একটু হাসলেন, 'আজ্ঞে না, না, USA হল আমার নাম, আর এটি আমার তৈরি দুনম্বর রোবট। প্রথমটি বিক্রি করেছি এক জাপানী বিজ্ঞানীকে।'

এরপর সঙ্গত কারণেই রোবটটাকে পরীক্ষা করে নিতে চাইলাম। সেকথা বলতেই অধ্যাপক অধিকারী সাগ্রহে রাজী হলেন, নিশ্চয় নিশ্চয়, বলুন অপারেট করা ছাড়া আর কি জানতে চান?'

'ধরুন রোবটটার একটা হাত বা পা দুর্ঘটনায় নষ্ট হয়ে গেল; তখন কি তাকে ব্যবহার করা যাবে নাকি সেখানেই অভিযানের ইতি ঘটবে?'

কিছু না বলে অধ্যাপক অধিকারী USA—2 এর ডান পা-টা খুলে ফেললেন, তারপর মাথার সুইচ গুলো টিপতে টিপতে বললেন, এক্ষুনি ও আমাদের জন্য চিকেন তৈরি করে এনে খাওয়াবে।'

তারপর স্টার্টার সুইচটা টিপতেই রোবটটা হাঁটতে লাগলো, ঠিক স্বাভাবিকভাবে নয়, একপায়ে লাফাতে লাফাতে, কখনও বা পড়ে গিয়ে আবার উঠে হাঁটতে লাগলো। ঐ অবস্থাতেই পৌঁছে গেল বাড়ির পেছনে মুরগীর খাঁচার কাছে, খাঁচার দরজা খুলে দ্রুতগতিতে বার করে আনলো একটা বড় মুরগী, তারপর ততোধিক দক্ষতায় তার পালক ছাড়িয়ে ফেলল; তারপর একইভাবে সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠে কিচেনে ঢুকে গেলো।

অধ্যাপক অধিকারী আমাদের দিকে ফিরে বললেন, 'আসুন আমরা ড্রইংরুমে বসি; এখুনি চিকেন পেয়ে যাবে।'

ড্রইং রুমে ঘড়ি ধরে বসে আছি, ম্যাকফারলন দেওয়ালে আঁটা পোর্ট্রেটগুলো দেখছেন, এমন সময় ঠিক সাত মিনিটের মাথায় একটা ট্রেতে তিন প্লেট চিকেন নিয়ে ঢুকলো USA—2.

আমি মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখছি, হঠাৎই একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেলো; লাফিয়ে আসতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে রোবটটা মেঝেয় পড়ে গেল। কিন্তু অবাক বিস্ময়ে দেখলাম ওর হাতে ট্রেটা ঠিক ধরা আছে; পড়ে থাকা অবস্থাতেই ও ট্রেটা বাড়িয়ে দিল অধ্যাপক অধিকারীর দিকে। অধ্যাপক অধিকারী ট্রেটা নিয়ে টেবিলে রাখলেন তারপর স্টার্টিং সুইচটা অফ করে ওকে ল্যাবরেটরীতে আগের মতই রাখতে গেলেন।

এই পর্যন্ত বলে অধ্যাপক বোধিসত্ত্ব একটু থামলেন। জিজ্ঞাসা করলাম, 'তারপর'?

উনি বললে, 'এ পর্যন্ত সব ঠিক ছিল, কিন্তু আসল ঘটনা শুরু হল ঐদিনই রাত্রি থেকে, আর সেটাই এ কাহিনীর মূল অংশ।' অধ্যাপক নিভে যাওয়া পাইপটায় পুনরায় অগ্নি সংযোগ করলেন।

রাত তখন এগারোটা' বাইরে চাঁদের অল্প আলো। পাশের বেডে ম্যাকফারলন নাক ডাকাচ্ছেন। আমি উঠে জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়ালাম। বাইরে খুব সুন্দর হাওয়া দিচ্ছে, গাছপালাগুলো দুলছে, দৃশ্যটা আরো ভালো লাগছিল এইজন্য যে জায়গাটা নির্জন। আমি অভিভূত হয়ে গেলাম। কতক্ষণ এভাবে দাঁড়িয়েছিলাম খেয়াল নেই। হঠাৎ সম্বিত ফিরে পেলাম কুকুরের তীক্ষ্ণ আওয়াজে। নিচে আবছা অন্ধকার থেকে একটা ঝটপটানি আওয়াজ ভেসে আসছে। টর্চটা জ্বেলে দরজা খুলতে গেলাম, ম্যাকফারলন তখন জেগে উঠেছেন, আমার কাছে এসেই বললেন, 'তাড়াতাড়ি চলুন'

দুজনে সিঁড়ি বেয়ে দ্রুত নেমে গেলাম। কুকুরটার চিৎকার ততক্ষণে থেমে গেছে। তাড়াতাড়ি গিয়ে দেখি একটা ঝোপের নিচের অন্ধকারে কি যেন পড়ে আছে। টর্চ জ্বালতেই দেখি—কুকুরটার মৃত দেহ পড়ে ; দেহ থেকে মাথাটা বিচ্ছিন্ন অবস্থায় একটু দূরে পড়ে আছে। ফিরে গিয়ে অধ্যাপক অধিকারীকে সব বললাম। সব শুনে ওঁর মুখটা কেমন যেন ফ্যাকাশে হয়ে গেল, তাড়াতাড়ি নিচে নেমে যেতে লাগলেন। জগন্নাথ ততক্ষণ সমস্ত আলোগুলো জ্বেলে তার মালিককে অনুসরণ করছে। তাদের দুজনকে অনুসরণ করছি আমরা দুজন। নিচের তলায় নেমে ল্যাবরেটরীর সামনে দিয়ে যাবার সময় হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লেন অধিকারী, তারপর অসফুটস্বরে বলে উঠলেন, 'আরে, ল্যাবরেটরীর দরজাটা খোলা কেন ?'

আমি চমকে উঠলাম। বললাম, 'কই একটু আগে তো দরজাটা খোলা ছিল না। আপনি দেখেছেন ম্যাকফারলন ?

'কই খেয়াল করিনি তো।'

অধ্যাপক অধিকারী ততক্ষণে ল্যাবরেটরীতে ঢুকে পড়েছেন। জ্বালিয়ে দিয়েছেন ভেতরের আলো। আমরাও ঘরে ঢুকলাম। ঢুকেই চমকে উঠলমে। সারাঘরে রক্ত ছড়ানো। রোবট বসে রয়েছে তার চেয়ারে, ঠিক সকালে যেমন দেখেছি। সারাদিন ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করলাম। পুলিশও এসেছিল কোনও কিনারা করতে পারেনি। একটু সকাল সকাল ঘুমিয়ে পড়লাম। আজ

অধিকারীর মাথাটা পেছন থেকে ঘুরিয়ে দেবার চেষ্টা করছে···

সকালে জগন্নাথ আর বাড়ি যায়নি, নিচের বারান্দাতেই শুয়েছে। সারাদিন খুব ধকল গেছে। গত রাতে ভালো ঘুম হয়নি, তাই কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমটা গভীর হল।

কতক্ষণ কেটে গেছে খেয়াল নেই, হঠাৎ ঘুমটা ভেঙে গেল একটা আওয়াজে, কিসের আওয়াজ জানার জন্য কান খাড়া করে শুয়ে রইলাম। হঠাৎ একটা গুলির আওয়াজ ভেসে এল, সেই সঙ্গে একটা অস্পষ্ট আর্তনাদ, 'বাঁচাও'।

তাড়াতাড়ি দরজা খুলে বের হলাম, দেখলাম আওয়াজটা অধ্যাপক অধিকারীর বেডরুমের দিক থেকে আসছে। সেদিকেই ছুটে গেলাম। দেখলাম ঘরের আলোটা জ্বলছে। দরজা বন্ধ, ভেতর থেকে সেই আর্তনাদ বন্ধ হয়ে গেছে।

দরজাটা খুলে ফেললাম। যে দৃশ্য দেখলাম তাতে রক্ত হিম হয়ে গেল। চারফুট রোবটটা সাড়ে পাঁচ ফুট লম্বা অধিকারীর মাথাটা পেছন দিকে ঘুরিয়ে দেবার চেষ্টা করছে, অধিকারী প্রায় ঢলে পড়েছে, কিন্তু চোখ দুটো ভয়ঙ্কর রকম বিস্ফোরিত, আমি কিছু ভেবে ওঠার আগেই রোবটটা অধ্যাপক অধিকারীকে ফেলে দিল মেঝেতে। আমি ততক্ষণে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়চ্ছি। কোথায় যাবো ঠিক নেই, তবু দৌড়তে লাগলাম। দোতলা থেকে একতলা, একতলা থেকে সামনের লন, সেখান থেকে রাস্তা ধরে দৌড়তে লাগলাম। হঠাৎই মনে হল কাছেই তো থানা, থানায় গেলে কেমন হয়।

কিছুক্ষণ পরেই পুলিশ নিয়ে সেখানে ফিরলাম। ইতিমধ্যে আমি যখন পালিয়ে যাচ্ছিলাম, তখন আমার পায়ের আওয়াজে ঘুম ভেঙেছে জগন্নাথের, জগন্নাথই ডেকেছে ম্যাকফারলনকে, আবিষ্কার করেছে মৃতদেহ। পুলিশ নিয়ে প্রথমেই ডেডব্‌ডির কাছে গেলাম। বিস্ফোরিত চোখ, ঠিক যেমনটি দেখেছিলাম খানিক আগেই, ঘরে ইতস্তত জিনিসপত্র ছড়ানো, অধিকারীর হাতে রিভলবারটা শক্ত করে ধরা, সম্ভবত নিজেকে বাঁচাতে ঐ রিভলবার থেকেই গুলি ছুঁড়েছিলেন অধ্যাপক, যার শব্দ আমি শুনেছিলাম। মেঝেতে দুতিনটে ব্যবহৃত কার্তুজ। কিন্তু ঘরে রোবটটাকে দেখতে পেলাম না।

সবাইকে নিয়ে নেমে এলাম নিচে, ল্যাবরেটরীর দরজাটা প্রত্যাশা মতই খোলা পেলাম। জগন্নাথ বলতে লাগলো, 'কাল সন্ধ্যায় আমি নিজে হাতে দরজায় তালা দিয়েছিলাম।'

ল্যাবরেটরীর আলোটা জ্বাললাম। রোবটটা বসে আছে নিজের চেয়ারে ঠিক আগের মতই, স্টার্টিং বোতাম বন্ধ। পুলিশ অফিসার পাণ্ডেকে সব ঘটনা থানাতেই জানিয়েছি, তাই তিনি খুঁটিয়ে রোবটটাকে পরীক্ষা করতে লাগলেন। রোবটটাই যে আসল খুনী তার প্রমান হিসেবে পেলেন এক-গোছা মাথার চুল, নিশ্চয় অধ্যাপক অধিকারীর আর বুকের ডান দিকে ফাইবারের মধ্যে গাঁথা একটা বুলেট, যে বুলেট সম্ভবত অধ্যাপক অধিকারীই ছুঁড়েছিলেন।

পরের দিন সকালেই আমি আর ম্যাকফারলন ফিরে এলাম আমার কলকাতার বাড়িতে, কয়েকদিন বিশ্রামের জন্য। রোবট নিয়ে হিমালয়ের বুকে ইয়েতির ওপর গবেষণা করার পরিকল্পনা অতঃপর আমাদের ছাড়তে হল।

অধ্যাপক থামতেই প্রশ্ন করলাম, 'কিন্তু যন্ত্রমানবটা হঠাৎ যন্ত্রদানবে পরিণত হল কেন?'

অধ্যাপক বোধিসত্ত্ব বললেন, 'সেটা আমার জানা নেই, রোবট বিজ্ঞানীরাও জানেন না, তবে আমার মনে হয় খোঁড়া অবস্থায় রক্তপাত করার আদেশ দিয়ে উনি রোবটটাকে হিংস্র করে দিয়েছিলেন, তাই হত্যা-পিপাসা মেটাতে ওটা নিজের স্রষ্টাকে পর্যন্ত হত্যা করতে দ্বিধা করেনি। ব্যাপারটা অনেকটা ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের মত।'

এবার উঠতে হবে, বাইরে আকাশে ভীষণ মেঘ জমেছে। বৃষ্টি নামবে এখনি।

গ্রাম ও পোঃ—চোপা ; হুগলী।

"কৃষি হচ্ছে আমার পেশা"

গঙ্গারাম তার পেশার জন্যে গর্বিত।

এটি এমন একটি পেশা যার মাধ্যমে সে দেশের জনগনকে অন্ন জোগায়। আর এই পেশা থেকে তার ভাল আয়ও হয়।

কৃষি এখন আর আগের মত একটা অলাভজনক এবং লোকসানের পেশা নয়।

স্বাধীন ভারত সুনিশ্চিত করেছে যাতে কৃষকেরা তাদের প্রাপ্য ঠিকমত পেতে পারে – উন্নত বীজ, উন্নত জল সেচ ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ, সার এবং কীটনাশক– সমস্ত কিছুই ভর্তুকী মূল্যে।

সময় মত ঋণ এবং তাদের উৎপাদিত দ্রব্যের একটা ভাল দামও সুনিশ্চিত করা হয়েছে। কৃষকেরা এখন এই সমস্ত সুবিধার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করছে।

প্রযুক্তি এবং পরিশ্রমের সংমিশ্রণে সবুজ বিপ্লবের পথে আমরা এগিয়ে চলেছি।

বর্তমানে ভারতের শস্য উৎপাদনের পরিমান ১৭ কোটি টনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে–১৯৪৭ সালের উৎপাদনের তুলনায় তা ১২ কোটি টন বেশী।

আমাদের প্রগতির জন্য আমরা গর্ব্বিত

davp 89/278 Bang

দৃষ্টি বিভ্রম

সৌমেন চ্যাটার্জী

চোখ আমাদের দর্শন ইন্দ্রিয় তা সবারই জানা আছে। কিন্তু বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই চোখই হয় আমাদের দর্শনে ভ্রান্তির মূল কারণ। সেই রকমের কয়েকটির প্রসঙ্গেই আজ আলোচনা করছি। আশা করি পাঠকবন্ধুদের কিছুটা উপকার হবে।

টাওয়ার ক্লকের ডায়াল

আমাদের মাথার অনেক উপরের কোনো জিনিসের বিশেষ করে টাওয়ার ক্লকের আকার অনুমান করার সময়ে আমরা অনবরত এই একই ভুল করি। আমরা জানি এই ঘড়ি গুলি খুবই বড়, তবু আমাদের অনুমিত আকার বাস্তবের চেয়ে অনেক ছোট হয়। 1নং চিত্রে দেখানো হয়েছে, লণ্ডনের ওয়েস্ট মিনিস্টার টাওয়ার ক্লকটিকে নীচে রাস্তায় আনলে তা কত বড় দেখবে। সাধারণ মানুষকে এর কাছে

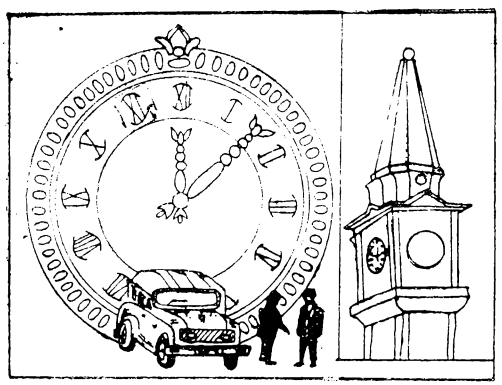

চিত্র—1

লিলিপুট বলে মনে হবে। তা সত্ত্বেও ঐ দূরবর্তী ক্লক টাওয়ারের মধ্যে যে ফোকরটি দেখানো হয়েছে, তার মধ্যে এটা কিন্তু ঠিক আটকে যাবে—বিশ্বাস না হলেও সত্যিই তাই!

যে প্রতিকৃতি চেয়ে চেয়ে দেখে

কখনও কখনও আমরা বেশ কিছু প্রতিকৃতি দেখে থাকি যা আমাদের সরাসরি দেখে। যেদিকেই যাই না কেন একই ঘটবে। বহুকাল পূর্বেই মানুষ এই ধরনের চিত্র দেখেছে এবং সেগুলো ধাঁধায় ফেলেছে। অনেকে অস্বস্তিও বোধ করেছে। রাশিয়ার মহান লেখক নিকোলাই গোগোল তাঁর প্রতিকৃতি সম্পর্কে একটি অপূর্ব বিবরণ দিয়েছেন ঃ

চিত্র—2

"চোখ দুটি যে আমাকে বিঁধে ফেলেছিল এবং মনে হচ্ছিল সবকিছু ছেড়ে আমার উপর নজর রাখছে।....."।

এই ধরণের প্রতিকৃতির কৌশল হল চোখের তারাটিকে ঠিক চোখের মাঝখানে বসানো। আমাদের দিকে সরাসরি কেউ তাকালে তার চোখের মনিটিকেও আমরা ঠিক চোখের মাঝখানেই দেখব। আমাদের অবস্থানের সাপেক্ষে মুখটাকে আমরা একই জায়গায় দেখতে থাকি বলে আমরা স্বাভাবিক-ভাবেই মনে করি যে, প্রতিকৃতিটা আমাদের দিকে ঘাড় ফিরিয়েছে এবং আমাদের লক্ষ্য রাখছে। সুতরাং বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না যে, কেন ঐ ধরনের ছবি অনেকের অস্বস্তির কারণ। চিত্র 2 ঠিক ঐ রকমের একটি প্রতিকৃতি। আজকাল এ ধরনের প্রতিকৃতি বিভিন্ন বিজ্ঞাপনে ব্যবহৃত হচ্ছে।

চিত্রকলার পুরো শিল্পটাই এই বিভ্রমের উপর নির্ভর-শীল। অষ্টাদশ শতাব্দীর মহাপণ্ডিত ওয়লার তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ "লেটার্স্ অন ভেরিয়াস ফিজিক্যাল সাবজেক্টস্"—এ লিখেছেন, "যে জিনিসটা বাস্তবে যা তাকে আমরা যদি সেই-রকম মনে করতাম তাহলে ঐ শিল্পের কোনো অস্তিত্ব থাকত না এবং আমরা অন্ধ হয়ে যেতাম। চিত্রকর বৃথাই রং মেশাতে চেষ্টা করত, কারণ আমরা তখন দেখতাম এখানে লাল রয়েছে এবং ঐখানে নীল এখানে কালো রয়েছে এবং

ওখানে ডোরা।.....দৃষ্টির সম্পূর্ণতা পেলে সেটা তো উল্টে দুঃখের কারণই হয়ে ছাঁড়াতো, তখন আর এখনকার মতো প্রতিদিন মনোরম সব শিল্পের নিদর্শন উপভোগ করতে পারতাম না।"

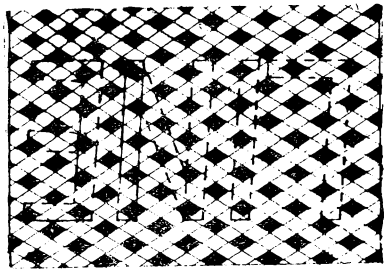

হরফগুলো বাঁকা মনে হলেও কিন্তু প্রত্যেকটিই সোজা বা খাড়া আছে। (চিত্র-3)।

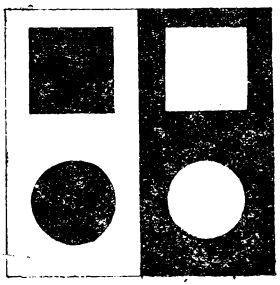

বর্গক্ষেত্র ও বৃত্তগুলি দূর থেকে ছোট বড়ো মনে হলেও আসলে ওগুলি সমান(চিত্র নং-4)

সাদা কালিগুলো যেখানে ছেদ করছে, সেখানে ছোট ছোট ধূসর বর্গক্ষেত্র দেখা দেয় ও মিলিয়ে যায় যদিও কালিগুলো আগাগোড়ইে সাদা। কালো বর্গক্ষেত্রগুলোর

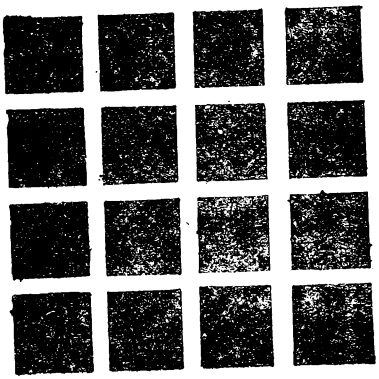

উপর কাগজ চাপা দিলেইসেটা প্রমাণ করা যাবে। বৈসাদৃশ্যের জন্যই এই বিভ্রম। (চিত্র-5)

পোষ্ট—শিবপুর, জেলা—হাওড়া, পিন—711102

24 ঘণ্টায় একদিন হলে 24 ঘণ্টায় একরাত্রি নয় কেন ?

কি ছোট কি বড় যদি কাউকে প্রশ্ন করা হয়—কত ঘণ্টায় একদিন ?

উত্তরে সে বলবে—24 ঘণ্টায়।

বস্তুতঃ উত্তরটা কিন্তু ভুল। যেহেতু বিজ্ঞান শাস্ত্র মতে 24 ঘণ্টায় একদিন বলে কোন কথা বা শব্দ থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। যেমন উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে—আজ সকাল 6টা থেকে আগামীকাল সকাল 6টা পর্যন্ত এই 24 ঘণ্টায় যদি "একদিন" বলে (প্রচলিত অর্থে) পরিগণিত হয় তবে আজ রাত্রি 6টা থেকে আগামীকাল রাত্রি 6টা এই 24 ঘণ্টায় "একরাত্রি" হবে না কেন। কিন্তু এ পর্যন্ত "একরাত্রি"—সময় কালের এই সাংকেতিক শব্দটির ব্যাবহার উক্ত সময়ানুসারে হয়নি। বরং এ রকম বলতে শোনা গেছে একদিন একরাত্রি। তাহলে প্রশ্ন—এই একদিন একরাত্রির সময়ের হিসেবটা কি। তা কি 24 + 12 = 36 ঘণ্টা ? না কি 12 + 12 = 24 ঘণ্টা ? যদি দ্বিতীয় হিসেবটাকেই যুক্তিমতে মেনে নিতে হয় তবে 24 ঘণ্টায় "1 দিন"—সময় নির্দেশক এই সাংকেতিক শব্দটার প্রয়োগও যুক্তি মতে ঠিক নয়। বস্তুতঃ "একদিন" (1 দিন) এই প্রচলিত শব্দটির দ্বারা নির্দেশিত সময় কালের মধ্যে শুধু যে দিবাতাপ (আলো) থাকে তাই নয়। নিশাভাগও (অন্ধকার) থাকে। আর এই সাধারণ সত্যটা জেনেও "24 ঘণ্টায় 1 দিন"—শব্দ প্রয়োগের এই বড় রকম ভ্রান্তিটা লালন পালন করে চলা হচ্ছে।

তাহলে যুক্তি মতে সেটা বলা উচিত তা এই ঃ—12 ঘণ্টায় দিন বা একদিন এবং 12 ঘণ্টায় রাত্রি বা একরাত্রি।

অর্থাৎ একদিন হল দিন এবং রাত্রির সমপরিমান সময়ের মিলিত সময়।

যেমন ঃ— একদিন = দিন + রাত্রি (শব্দার্থে)

24 ঘণ্টা = 12 + 12 (সময়ার্থে)

এর দ্বারা 24 ঘণ্টা—এই নির্দেশিত সময়কালের সাংকেতিক শব্দটি যা হওয়া উচিত তা "একদিন" বা "একরাত্রি" নয়, বরং হওয়া উচিত একটি স্বতন্ত্র সাংকেতিক শব্দ যথা "দিনাত্রি"।

যার ইংরেজি প্রতিশব্দ হতে পারে "D. Night."

শ্যামল মজুমদার

পুজো সংখ্যায়

কম খরচে **10**টি অভিনব মডেল
সার্কিট ডায়াগ্রাম সহ লিখবেন ঃ

বিপ্লব ব্যানার্জী ॥ সৌম্য মিত্র
দীপেন ভট্টাচার্য ॥ সৌমেন্দু বিকাশ পাত্র
মলয় খাঁটুয়া ॥ নির্মলেন্দু বিকাশ পাত্র
অনুরুদ্ধ সরকার ॥ অভিজিৎ সরকার
গিরীশ রায় বর্মন ॥ ভাস্কর চট্টোপাধ্যায়
পার্থসারথি চক্রবর্তী

এবং **10**টি চমকপ্রদ সায়েন্স
এক্সপেরিমেণ্টস
হাতে কলমে শেখাবেন ঃ

সন্তোষ মিত্র ॥ অমর নাথ রায়
দিবাকর সেন ॥ অপাজিত বসু
কুঞ্জবিহারী পাল ॥ সমীর কুমার ঘোষ
ও আরও অনেকে

পুজোর ছুটী ফুরিয়ে গেলেও
যে বইয়ের প্রয়োজন ফুরোয় না

শারদীয়

কিশোর জ্ঞান ও বিজ্ঞান

বেরোবে পুজোর আগেই

ছড়া

ক্ষুদে শত্রু ভাইরাস

দেবব্রত রায়

হাঁচি কাশি মাথাব্যথা
জ্বর জ্বালা আর,
চারদিকে রোগব্যধি
অশেষ প্রকার।
ছোট্ট ছেলের হাম হয়েছে
ঠাকুরদাদার কাশি—
গড়ছে বাসা তাদের মাঝে
ভাইরাস (বিষ) আসি।
ছোটোখাটো নামটি এবং
অতিক্ষুদ্র আকার
দেহের বাইরে আছে একটি
প্রোটিন গড়া প্রাকার।
তারি তলে অ্যাসিড আছে
নিউক্লিক তার নাম
জীবদেহের মধ্যে এরা
গড়ে নগর ধাম।
জল, স্থল অন্তরীক্ষ এবং
জীবের দেহ
সব জায়গাতেই আছে এরা
দেখতে পায়না কেহ।
দেহের মাঝে ঢুকে গেলেই
বিপদ ঘটে অতি,
শরীর স্বাস্থ্যের অনেকখানি
করবেই সে ক্ষতি।
জীবদেহে প্রাণী সে যে
বাইরেতে জড়
হুটোপুটি ছোটাছুটি
চঞ্চল বড়।
অন্য গুন নাই তার
ছেলেপিলে হয়,
'জড়' নয় 'জীব' তারে
তাইতেই কয়।

চাঁদের অভিকর্ষ

তপনকুমার বিশ্বাস

পৃথিবীর উপগ্রহ অপরূপ ঐ চাঁদের আকার প্রায় গোলকের মত। ব্যস পৃথিবীর প্রায় চারভাগের এক ভাগ। এই সব কারণে চাঁদের অভিকর্ষ পৃথিবীর চাইতে অনেক কম। চাঁদের অভিকর্ষ বল পৃথিবীর ছয় ভাগের এক ভাগ মাত্র।

অভিকর্ষবল পৃথিবীর ছয় ভাগের এক ভাগ হবার ফলে কতকগুলি মজার ব্যাপার ঘটে চাঁদে। একবার লাফিয়ে উঠলে স্বচ্ছন্দে অনেকটা উপরে উঠে যাওয়া যাবে। যিনি পাঁচফুট হাইজাম্প দিতে পারেন, চাঁদে তিনি হেলাফেলায় শুধু একটা লাফ দিয়ে তিনতলা বাড়ী পেরিয়ে যাবেন। তিন তলার মত অত উঁচু থেকে নামবার জন্য তাই বলে হাত পা ভেঙে মৃত্যুশয্যাশায়ী হতে হবে না। কারণ তিনি নেমে আসবেন বেশ হেলতে দুলতে পাখীর পালকের মত ভাসতে ভাসতে। উঁচু পাহাড়ের উপর থেকে লাফ দিয়ে শূন্যে ভাসতে ভাসতে দিব্যি বড়সড় গহ্বর পার হয়ে বেশ অনেকটা দূরে ধীরে সুস্থে একেবারে অক্ষত অবস্থায় চাঁদের জমিতে নেমে আসতে পারবেন। তাই বলে মহাকাশচারীরা চাঁদে লাফিয়ে লাফিয়ে ঘুরে বেড়ান নি বা ভবিষ্যতে চাঁদে যারা যাবেন তারাও তা করবেন না। কারণ এই রকম লম্ফ দিয়ে পড়বার সময়ে গহ্বরের কিনারের সঙ্গে বা পাহাড়ের গায়ে বা পাথরে ঘষা লেগে মহাকাশের পোশাক স্পেশসুট ফেঁসে যেতে পারে বা পোশাকের ভিতরের জটিল যন্ত্রপাতি বিকল হয়ে যেতে পারে। পরিণতিতে হয়ত ঘটবে মৃত্যু।

তবে সহজ হবে অনেক কাজ করা। পৃথিবীতে যিনি পঞ্চাশ কেজি ওজন তুলতে পারেন চাঁদে তিনি সহজেই তিনশো কেজি তুলে ফেলবেন। বড় বড় ভারী ভারী ভারী যন্ত্রপাতি বা মালপত্র শুধুমাত্র হাত দিয়ে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় স্বচ্ছন্দে স্থানান্তরিত করা যাবে।

চাঁদে লম্বা লম্বা পা ফেলে জোরে জোরে হাঁটবার চেষ্টা করলে বা একটা জোরসে দৌড় দিতে গেলে বিপত্তি হবে। দেহের ভারসাম্য রাখা খুবই কঠিন হয়ে পড়বে। এত কম অভিকর্ষের মধ্যে হাঁটাচলা বা কাজকর্ম করতে আমরা অভ্যস্ত নই। আমাদের দেহের পেশীগুলো এই রকম কম অভিকর্ষের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতে শেখেনি। সেজন্য চাঁদে যিনি যেতে চাইবেন, তাঁকে বিশেষভাবে প্রশিক্ষণ নিতে হবে। কেমন ভাবে পা ফেলতে হবে, কেম ভাবে হাত নাড়তে হবে, কেমন করে দেহ ঘোরাতে হবে সবই আবার শিখতে হবে। পৃথিবীতে একটি শিশু যেমন করে হাঁটতে চলতে ফিরতে শেখে। চাঁদে আমাদের হেঁটে বেড়ানোটা পৃথিবীতে একটি ছোট্ট শিশুর হেঁটে বেড়াবার মত লাগবে দর্শকের কাছে। শিশুর মতই লঘু চঞ্চল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দৈর্ঘ্যের পদচ্ছন্দে হাঁটবেন তিনি।

ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর, ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর

জেনে রাখা ভাল

বিবেক রায়

1. জল পান না ক'রে উটেদের চেয়েও বেশি দিন বাঁচতে পারে ধেড়ে ইঁদুরেরা।

2. উটপাখিদের পাগুলি এতই শক্তিশালী যে এদের পায়ের এক লাথি খেলেই পূর্ণবয়স্ক একজন মানুষ কুপোকাৎ হয়ে যেতে পারে। আর মানুষটি যদি দুর্বল হয় তবে ঐ লাথির চোটে সে মারাও যেতে পারে।

3. কুকুর অতি উচ্চ কম্পাংক বিশিষ্ট শব্দ শুনতে পায় কিন্তু মানুষ সে শব্দ শুনতে পায় না।

4. অগভীরতম সাগর হচ্ছে 'The sea of Agov'। এই সাগরের গভীরতম স্থানটি হলো মাত্র তেরো মিটার গভীর।

5. ইউরোপের দেশগুলির মধ্যে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক জলহস্তী রপ্তানী করে থাকে 'হাঙ্গেরী'।

6. একটি মাছের হৃদ্‌পিণ্ডে দু'টি কক্ষ থাকে।

7. 'লিওনার্দো দা ভিঞ্চি' এক হাত দিয়ে যখন লিখতেন, অপর হাত দিয়ে তখন (অর্থাৎ একই সময়ে) ছবি আঁকতে পারতেন।

৪. আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে 'কফি' হচ্ছে দ্বিতীয় বৃহত্তম পণ্য সামগ্রী।

9. পুরুষ মশা দংশন করে না। কেবল মাত্র স্ত্রী মশকীরাই দংশন করে।

10. 1620 খ্রীষ্টাব্দে Gerald Tissain নামে এক ফরাসী ভদ্রলোক প্রথম 'আইসক্রীম' আবিষ্কার করেন।

আলেকজান্ডার বেলায়েভের কাহিনী অবলম্বনে

উভচর মানব

বাণীরূপ: অনিল কর্মকার/চিত্রায়ণ: গৌতম কর্মকার

কোন সন্দেহ নেই- এমন চমৎকার একটা নির্জন জায়গা। আমার ডুবুরি- জীবন আজ সার্থক হোল।

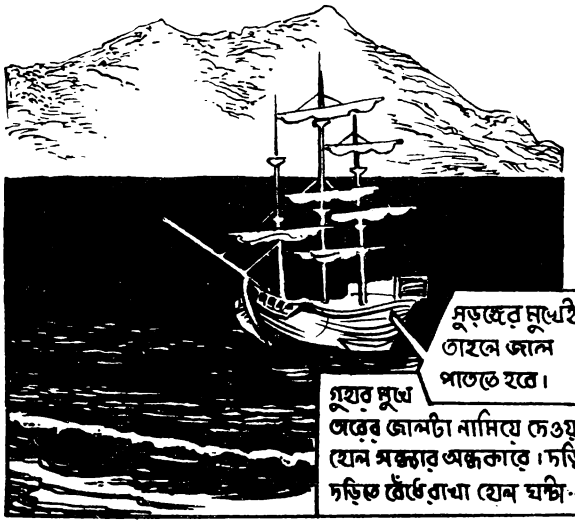

9

তোলো, তোলো। টেনে তোলো সবাই। জোরে টানো-
আরও জোরে!

ওহ, কী চতুর ফাঁদ!
জাল কেটে আমাকে
বেরুতেই হবে।

আসছে--আসছে--জলের ভিতর--ঐ তো

অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে
এবার।

টানো, আরো জোরে
টানো হে!

আহ, আমি পেরেছি! কী ভয়ঙ্কর এই
লোকগুলো। কিন্তু আমাকে নিয়ে
ওরা কী করবে?

ঐ যাঃ- পালালো! জাল
কেটে পালিয়ে গেল
দানোটা।

একি! এযে প্রায় মানুষের
মতোই দেখতে। জলের
রাজ্যে মানুষ!

ঠিক আছে, যাও। কিন্তু
আমিও তোমাকে ছাড়ছি
না। গেটা ফাঁড়িটা আমি
জাল আর ফাঁদ দিয়ে এবার
ঘিরে ফেলবো। দেখবো-
কেমন করে পালাও।

শুরু হয়ে গেল আয়োজন। খাঁড়ির তলায় এখানে-ওখানে তারের বেড়া, মাঝে মাঝে ফাঁদ। কিন্তু কোথায় সেই নীল সাগরের দানো, অথবা সাগরদেব?

ঘন্টার পর ঘন্টা সমুদ্রের জলের দিকে কেবল তাকিয়ে থাকে জুরিতা। হঠাৎ এক দিন মনে হয়- দানো এখন ডুব দিয়েছে সমুদ্রের তলায়। অতএব নেমে যেতে হবে সেইখানে।

বুয়েনস আইরেস থেকে নিয়ে আসা হোল ডুবুরির পোষাক, সঙ্গে অক্সিজেন সিলিন্ডার, ইলেকট্রিক টর্চ। জুরিতা আর বালথাজার - দু জনেই নেমে গেল জলের তলায়।

এলাকাটা এবার সন্ধান করে দেখতে হবে বাল থাজার। তুমি যাবে পশ্চিমে, আমি পূর্বে। স্থলভাগের সঙ্গে নিশ্চয়ই কোথাও যোগাযোগ আছে ঐ সুড়ঙ্গের।
ঘুরতে ঘুরতে এক দিন...
সাদা পাথরের দেয়াল! কে বানালো? জেলখানার চেয়ে উঁচু। অন একটা কেল্লা।
ওহ, একটু ফাঁক-ফোকরও কোথাও নেই যে ভিতরে তাকিয়ে দেখবো। ফটকটা এবার খুঁজে পেলে তবে জানা যাবে খানিকটা।
কয়েক দিন পর...
কেল্লাটায় যে থাকে তার খবর কিছু পেলে?
হ্যাঁ, এক জন ডাক্তার। নাম—সালভাতর। অলৌকিক শক্তিধর। রেড ইন্ডিয়ানরা বলে—উনি স্বয়ং ভগবান।
অন্ধকে উনি চক্ষু দান করেন, মৃতকে প্রাণ দেন।
তেমন কাউকে তুমি দেখেছো?
হ্যাঁ, একটা পা-ভাঙা লোক ওঁর চিকিৎসার পর দেখেছি ঘোড়ার মতো ছুটে বেড়াচ্ছে।
এই কি তবে সেই বিখ্যাত সার্জেন সালভাতর – ইউরোপ আর আমেরিকা দুই মহাদেশেই যাঁর এত নামডাক? দুঃসাহসিক অস্ত্রোপচার করতে যাঁর জুড়ি নেই পৃথিবীতে।
12

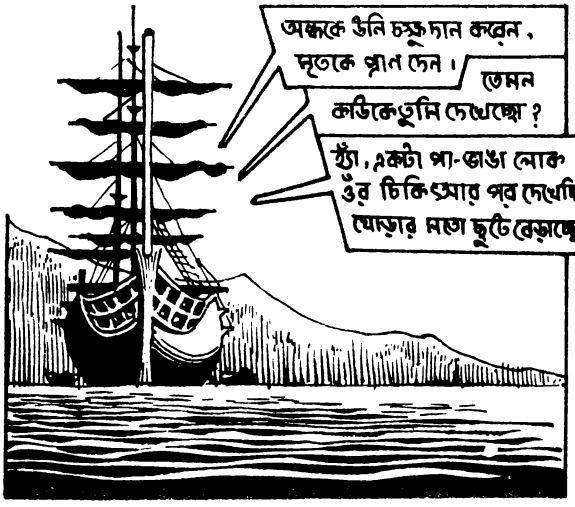

ষ্ট্যাম্প প্যাডের কালি তৈরি

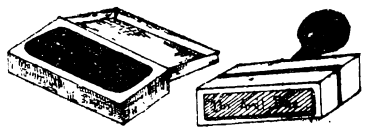

প্রোটন কুমার

আপনি যদি মাত্র দুই-তিন হাজার টাকা মূলধন নিয়ে কোনো ব্যবসা শুরু করতে চান তবে আপনার পক্ষে ষ্ট্যাম্প প্যাড কালি তৈরির ব্যবসাটি সুবিধাজনক হবে। ষ্ট্যাম্প প্যাডের কালি অফিস আদালত ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এমনকি নিজস্ব চিঠিপত্রাদি লেখার প্যাড এবং বই-পুস্তকে নাম ঠিকানা ছাপদেয়ার কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কাজেই বাজারে এটির যেমন বেশ চাহিদা আছে তেমনি এই কালি তৈরি করার কাজটিও খুবই সহজ।

ঃ 1টি ষ্টেইনলেসষ্টিলের কড়াই ও একটি হাতা ; ঃ 1টি প্লাষ্টিকের মগ ও 1টি বালতি ; ঃ 1টি ফিল্টার কাপড় ; ঃ 1টি ছোট দাঁড়ি পাল্লা ; ঃ 1টি গ্যাসের চুলা, উনুন কিংবা স্টোভ ; কালি ভরার জন্য উপযুক্ত মাপের কাঁচের শিশি বোতল কর্ক, লেবেল ইত্যাদি।

এবার আসা যাক কালি তৈরি করার জন্য যেসব কাঁচামাল লাগবে তাদের কথায়।

মোটামুটি 21 থেকে 14 লিটার ষ্ট্যাম্প প্যাড কালি তৈরি করার জন্য প্রয়োজন হবে ঃ

ঃ গ্লিসারিন	—2 কেজি
ঃ ইথিলিন গ্লাইকল	—1 লিটার
ঃ মিথাইল ভায়োলেট	—200 গ্রাম
ঃ মিথিলিন ব্লু	—30 গ্রাম
ঃ ফরমালডিহাইড	—100 সি-সি
ঃ বাবলার আঠা বা অ্যারাবিক গাম	—50 গ্রাম
ঃ বাকী	—বিশুদ্ধ জল।

আসলে ষ্ট্যাম্প কালি আর কিছুই নয়, মিথাইল ভায়োলেট ও মিথিলিন ব্লু নামক রঙ্ দুটির একটি জলীয় দ্রবণ। গ্লিসারিণ ও ইথিলিন গ্লাইকল ব্যবহারের উদ্দেশ্য হলো কালিটি যাতে তাড়াতাড়ি শুকিয়ে না যায়। জৈব রঙ গুলির দ্রবণে যেন কোনো পচন না ধরে। অর্থাৎ এটি 'প্রিজারভেটিভ' (Preservative) হিসেবে কাজ করবে।

এবার বলি ঐ কালি তৈরির কৌশলের কথা। কৌশল তেমন কিছু নয় কেবল উপযুক্ত পরিমাণ জলের সঙ্গে অন্যান্য দ্রব্যাদি মিশ্রিত করা ও বোতলজাত করা। প্রথমে কড়াইটিতে গ্লিসারিণ ফেলুন এবং এতে পরিমাণ মতো জল মেশান। হাতা দিয়ে মিশ্রণটি নেড়ে দিয়ে এটিতে এখন আস্তে আস্তে মিথাইল ভায়োলেট ও মিথিলিন ব্লু রঙের গুঁড়ো মেশান। রঙ্ দুটি যাতে ভালভাবে মেশে সেজন্য মিশ্রনটিকে কিছুক্ষণ ভালভাবে নাড়ুন। দেখবেন, সুন্দর গাঢ় বেগুনি রঙের একটি মিশ্রণ তৈরি হয়েছে। জলেতে গ্লিসারিন মেশানোর সময় মিশ্রণটি একটু গরম হয় তবে রঙ্ দুটি মেশানো ও নাড়ানাড়ি করার সময় মিশ্রণটি ঠাণ্ডা হয়ে আসতে পারে। সেজন্য কড়াইটিকে চুলোয় বসিয়ে গরম করুন। এবার মিশ্রণটিতে ঢালুন ইথিলিন গ্লাইকল এবং বাবলার আঠার গুঁড়োও তার সাথে মিশিয়ে দিন। মিশ্রণটিকে ভালভাবে নেড়ে দিন এবং সবশেষে ঢালুন ফরমালডিহাইড। আবার নেড়ে দিয়ে কড়াইটিকে এবার চুলো থেকে নামান। ঠাণ্ডা হলে মগে করে মিশ্রণটিকে বালতিতে ঢেলে নিয়ে একদিন স্থির অবস্থায় রেখে দিন। একদিন পর আপনার তৈরি কালিকে ফিল্টার কাপড়ের সাহায্যে ছেঁকে নিন এবং নির্দিষ্ট মাপের—যেমন 30, 50, বা 100 সি-সি—শিশিতে কিংবা 1 মিটার মাপের বোতলে ভরে লেবেল লাগিয়ে বাজারে বিক্রয় করার চেষ্টা করুণ। এতে শতকরা 35 টাকা পর্যন্ত লাভ হতে পারে।

অবশ্য লাভের পরিমাণটা যদি আরো বাড়াতে চান তবে নিম্নের ফর্মুলাটি আপনি কাজে লাগাতে পারেন।

ফর্মুলা

ঃ গ্লিসারিন	—2 কেজি 580 গ্রাম
ঃ বিশুদ্ধ জল	—1 কেজি 850 গ্রাম
ঃ মিথাইল ভায়োলেট	— 190 গ্রাম

কড়াইতে গ্লিসারিণ ঢালুন ও জল মেশাণ। মিশ্রণ একটু নেড়ে দিয়ে চুলাতে বসিয়ে গরম করুণ (65 ডিগ্রী সেলসিয়াস)। এর পর মিথাইল ভায়োলেটের গুঁড়ো আস্তে আস্তে মেশান এবং নাড়তে থাকুন। এরপর আগের মতো।

সৌজন্য ঃ আজকের বিজ্ঞান, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলা দেশ, ঢাকা।

মডেল বানাতে গিয়ে ঃ পাঁচ

রাজেশ গিরি

কি বোর্ড ইউনিট ঃ—

এই ইউনিটটি কতগুলো সাধারণ অন / অফ সুইচ এবং একটা পুশ-টু-অন (কলিং বেলে যে সুইচ ব্যবহৃত হয়) সুইচ দ্বারা গঠিত। অন / অফ্ সুইচগুলোর প্রত্যেকটির একটি করে নম্বর দিতে হবে, এবং এগুলো একটা বোর্ডে লাগাতে হবে। (বিস্তারিত পরে)

রিলে ইউনিট ঃ—

কেবলমাত্র কতকগুলো রিলে নিয়ে এই ইউনিটটি গঠিত।

কি বোর্ডে যতগুলো অন / অফ্ সুইচ থাকবে, রিলে থাকবে তার থেকে একটা কম। 'কি বোর্ড ইউনিট এবং রিলে ইউনিট'—এই ইউনিট দুটো একে অপরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত তাই এই ইউনিট দুটিকে একসঙ্গে বলা যেতে পারে কি বোর্ড রিলে ইউনিট।

দেখা যাচ্ছে (ছবি দেখ) SW_1 টিপে তারপর SW_2 টিপলে অর্থাৎ অন্ করলে RL_2 অন্ হচ্ছে কিন্তু, SW_1 না টিপে SW_2কে টিপলে টাইমার ইউনিটের একটি বিশেষ বর্তনী সম্পূর্ণ হচ্ছে RL_2 অন্ হচ্ছে না। [এই বিশেষ বর্তনী সম্পূর্ণ হলে সমস্যা মিটবে তা পরে বলছি।]

কি বোর্ড—রিলে ইউনিটে এই ভাবে পরপর একটি সুইচ ও একটা রিলে জুড়ে জুড়ে একই সার্কিটের পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে এবং এর ফলে দেখা যাচ্ছে SW_1, SW_2, SW_3, SW_4 এবং SW_5 পর পর অন্ করে গেলে RL_1, RL_2....এইভাবে শেষে RL_5 অন্ হবে। কিন্তু SW_1 SW_5 অন্ করার সময় কোথাও যদি জাম্প করা হয় অর্থাৎ SW_1 থেকে পর পর SW_2, SW_3, SW_4 হয়ে SW_5 অন্ করার অর্ডার যখনই ভাঙ্গা হয় সঙ্গে সঙ্গে টাইমার

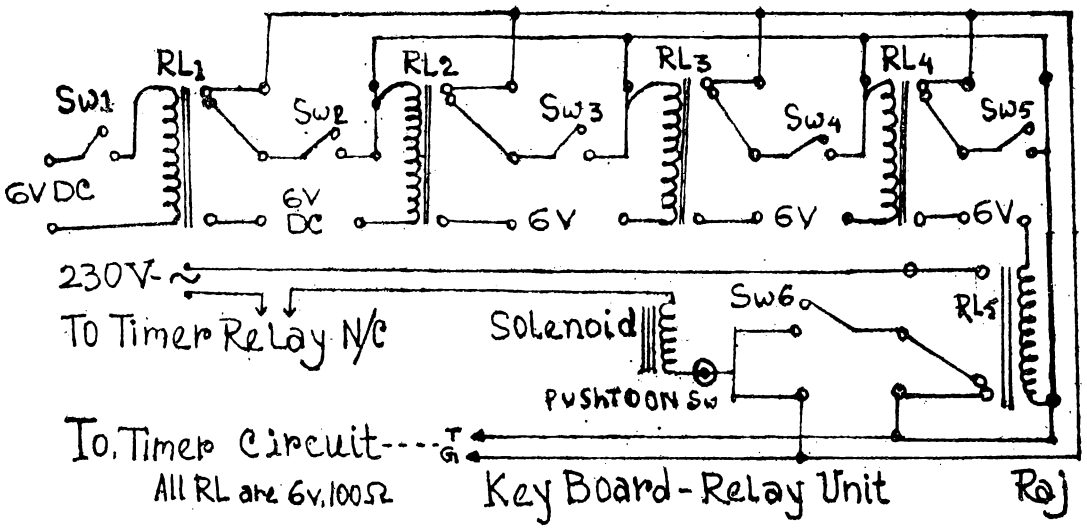

সার্কিট দেখে বোঝা যাচ্ছে 1নং সুইচটা (SW_1) অন্ করলে 1নং রিলেটা (RL_1) অন্ হচ্ছে। এর N/C কণ্টাক্টস্ SW_2 হয়ে টাইমার ইউনিটে চলে গেছে এবং N/O কণ্টাক্টস্ SW_2 এবং RL_2 হয়ে পাওয়ার সাপ্লাইয়ে গেছে। RL_1 অন্ হলে এর N/C কণ্টাক্টস্ ওপেন হয়ে যাবে এবং N/O জুড়ে যাবে, অর্থাৎ, RL_1 অন্ হওয়ার ফলে একটা বর্তনী ছিন্ন হবে এবং অপর এক বর্তনী সম্পূর্ণ হবে। এক্ষেত্রে বর্তনী দুটো হল টাইমার বর্তনী এবং RL_2 বর্তনী। ইউনিটের একটি বিশেষ সার্কিট সম্পূর্ণ হয়। তাই তালা খুলতে হলে SW_1 থেকে SW_5 পর পর অন্ করতে হবে, কিন্তু এতগুলো সুইচ (সুইচের সংখ্যা আরো বাড়ানো যেতে পারে) কি অর্ডারে বোর্ডে কোথায় ফিট আছে তা জানা না থাকায় চোর কোথাও না কোথাও ভুল করবেই এবং তালা না খুলে সাইরেন বেজে জানিয়ে দেবে এটা চোর!

[পরবর্তী সংখ্যায়]

ঘোড়াধরা-721507।

বিদ্যুৎ ও বজ্রপাত

শঙ্কর পাল

বজ্রপাত সম্বন্ধে আমাদের দেশে নানা আজগুবি ধারনা অনেকের মধ্যে বাসা বেঁধে রয়েছে। গ্রামের মোড়লরা বজ্রপাতের ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন 'ইন্দ্রের অস্ত্র' শাস্ত্রবিদ্ বলেন, 'দধীচির অস্থি দিয়ে গড়া বজ্রপাত্র"। এছাড়াও সাধারন মানুষের মধ্যে যে প্রবাদ প্রতিষ্ঠিত তা হল—"বজ্র একটা সূচের মত পদার্থ যা নাকি কলাগাছ কিংবা গোবরে পড়লে ভেতরে ঢুকে যায়।" —এসব কাল্পনিক ধারণা বর্তমান বিজ্ঞানের যুগে অচল।

1752 সালে বৈজ্ঞানিক ফ্রাঙ্কলিন তাঁর বিখ্যাত ঘুড়ির পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করেন যে মেঘ তড়িৎগ্রস্ত অবস্থায় থাকে। কিন্তু প্রশ্ন হল বায়ুমণ্ডলে ও মেঘে বিদ্যুৎ উৎপত্তির উৎস কোথায়?—সূর্য থেকে আসা অতিবেগুনী রশ্মি মহাজগৎ থেকে বিকিরিত মহাজাগতিক রশ্মি, পৃথিবীপৃষ্ঠের তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে নির্গত তেজস্ক্রিয় রশ্মি প্রভৃতি বায়ুমণ্ডলের কণা ও মেঘের জলবিন্দুকে সর্বদা তড়িতাহিত করে। ডক্টর জি. সি. সিম্পসন-এর 1909 সালে সর্বজন স্বীকৃত আবিষ্কৃত তত্ত্বই মোটামুটি ভাবে মেঘে বিদ্যুৎ উৎপত্তির রহস্যের সমাধান করেছে।

সিমলার পাহাড়ে বসে পরীক্ষা করে ডক্টর সিম্পসন দেখিয়েছেন যে, বাতাসের বেগ সেকেণ্ডে নয় গজের বেশি হলেই মেঘের মধ্যে অবস্থিত বড় জলবিন্দুগুলি ভেঙে ছোট হয়ে যায়;—এই ভেঙে যাবার প্রাক্কালে জলকণা থেকে কতকগুলি ইলেকট্রন বেরিয়ে গিয়ে পাশের বাতাসকে ঋণ-বিদ্যুতে তড়িতাহিত করে। জলপ্রপাত বা ফোয়ারার কাজের বাতাসকে ঠিক একই কারণে ঋণবিদ্যুতে আহিত হতে দেখা যায়। এখন ধনবিদ্যুৎ-যুক্ত জলকণাগুলি নিচে নামতে শুরু করলে উর্ধ্বগামী বাতাসের প্রচণ্ড প্রবাহে তারা বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং পুনরায় উপরের দিকে উঠে যায়। কিন্তু উপরে উঠেও নিস্তার নেই। কারণ সমতড়িৎ পরস্পরকে বিকর্ষণ করে সুতরাং একই ধন বিদ্যুতে পূর্ণ জলকণাগুলি উপরে উঠে পৃথক থাকার চেষ্টা করে,—এর ফলে ছোট জলকণাগুলি মিলে ঠিক আগের মত বড় বড় ফোঁটায় পরিণত হয় এবং আবার তারা নিচে নামতে শুরু করে। বলা বাহুল্য ফোঁটাগুলি তখন প্রচুর ধনবিদ্যুতে পরিপূর্ণ। নিচে নামার সময় আবার এগুলি ছোট ছোট জলকনায় বিভক্ত হয়, এবং একই ভাবে পুনরায় উপরে এসে বড় ফোঁটার আকার ধারন করে। এরূপ কিছুক্ষণ অবিরাম ওঠা-নামার ফলে ধনবিদ্যুতের পরিমান ক্রমশঃ বাড়তে থাকে। অবশেষে অধিকাংশ জলের ফোঁটা ধনবিদ্যুৎ সঙ্গে নিয়ে বৃষ্টির আকারে ভূপৃষ্ঠে পতিত হয়।

উপরিউক্ত আলোচনার মাধ্যমে আমরা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম তা হল "আকাশে যে মেঘ ভেসে বেড়ায় তা তড়িৎগ্রস্ত।"—এখন ধরা যাক্, পৃথিবীর উপরে থাকা কোন এক খণ্ড মেঘ কোন কারণে ধনবিদ্যুতে পূর্ণ হয়েছে। স্বাভাবিক কারণে তড়িতাবেশের ফলে ভূপৃষ্ঠ ঋণাত্মক আধান যুক্ত হবে। এ অবস্থায় মেঘ ভূপৃষ্ঠ একটি ধারকের (Condenser) ন্যায় কাজ করে,—যার মাঝখানে রয়েছে বায়ুমাধ্যম। ক্রমশ মেঘে যত আধানমাত্রা বাড়ে, ভূপৃষ্ঠের আধানও (ঋণাত্মক) তত বাড়তে থাকে। ভূপৃষ্ঠের ঋণাত্মক আধান বাড়া মানে—বাড়ীঘর, গাছপালা, জীবজন্তু সবারই ঋণাত্মক আধান বেড়ে যাওয়া। এভাবে আধান বাড়তে বাড়তে এমন একটা সঙ্কট মুহূর্তে পৌঁছায় যখন ঘটে তড়িৎ মোক্ষণ। অর্থাৎ বিদ্যুৎশক্তি ধনাত্মক আধান যুক্ত মেঘ থেকে ভূপৃষ্ঠে দিকে ধেয়ে আসে এবং নিকটবর্তী ঋণাত্মক জায়গায় আঘাত করে। এই প্রসঙ্গেই বলা প্রয়োজন, দুই বিদ্যুৎশক্তির প্রাবল্যে যখন বিদ্যুৎশক্তি অবক্রম (Potential Gradient) প্রতি ইঞ্চিতে প্রায় 30,000 ভোল্ট তখন বাতাসের বাধা তুচ্ছ হয়ে গিয়ে দেখা যায় উজ্জ্বল আলোর গতি ; যাকে বলে তড়িৎ মোক্ষন কিংবা বিদ্যুৎস্ফুরণ। যে পথে রোধ কম, সে পথেই তীব্র তড়িৎ প্রবাহ ঘটে। মেঘের বিদ্যুৎ যখন মেঘ থেকে ছুটে এসে পৃথিবী পৃষ্ঠে পড়ে, তখন এই বিদ্যুৎস্ফুলিঙ্গকেই আমরা বজ্রপাত বলি।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, তাহলে বিদ্যুৎ কি একটা আলোর মত জিনিস?—না, বিদ্যুৎকে কখনো চোখে দেখা যায় না। স্ফুলিঙ্গের আলো বিদ্যুতের আলো নয়। এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাবার প্রাক্কালে বিদ্যুৎশক্তি মাধ্যমের বাতাস ও ধূলিকণাকে উত্তপ্ত ও প্রজ্বলিত করে এবং তারই ফলস্বরূপ আমরা দেখতে পাই আলো।

বিদ্যুৎ চমকের আকৃতি-প্রকৃতি নানা রকম ; কখনো গগণ বিদীর্ণ করে আগুনের বলের মত সোজাপথে নীচে নেমে আসে, কখনো বা মেঘের কোলেই আঁকাবাঁকা পথে মিলিয়ে

যায়। যখন বিদ্যুৎ শক্তির প্রাচুর্য থাকে তখন সোজাপথে চলে ; তা না হলে গতিপথের কোন জিনিস দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়ে শাখা প্রশাখায় বক্রগতি দেখা যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ-যোগ্য সমস্ত বিদ্যুৎস্ফুলিঙ্গের রং একরকম নয়—কখনো সাদা, কখনো তামাটে, আবার কখনো বেগুনী। সাধারণতঃ কম উচ্চতার মেঘ থেকে সাদাস্ফুলিঙ্গ এবং খুব উঁচু মেঘ থেকে নির্গত স্ফুলিঙ্গ বেগুনী রঙের হয়। স্ফুলিঙ্গের রং দেখে মোটামুটি ভাবে মেঘের উচ্চতা সম্বন্ধে একটা ধারণা জন্মায়।

বিদ্যুৎস্ফুরণের পরেই শোনা যায় গগণভেদী গর্জন। বিদ্যুৎ প্রবাহ যে পথে চলে প্রচণ্ড তাপের জন্য সেখানকার বাতাস হঠাৎ উত্তপ্ত, সম্প্রসারিত ও হাল্কা হয়ে ওপরে উঠতে চেষ্টা করে এবং প্রায় সহসাই তা ঠাণ্ডা হয়ে যায়। সে সঙ্গে চতুর্দিকের বেশি চাপের বাতাস ও চাপ দেয়—ফলে হয় সঙ্কোচন। বাতাসের এরূপ দ্রুত সঙ্কোচন ও প্রসারণের ফলে প্রচণ্ড শব্দের সৃষ্টি হয়, যাকে বলা হয় বজ্রনাদ। বিদ্যুৎ যখন সোজা পথে গিয়ে কাছের মেঘে আঘাত করে তখন কামানের গোলা ছোড়ার আওয়াজের ন্যায় কেবল একটা শব্দ শোনা যায়, আর যখন আঁকাবাঁকা পথে চলে তখন শোনা যায় গুরুগুরু আওয়াজ। এই প্রসঙ্গেই বলে রাখা ভাল, বজ্রনাদ শুনলে বজ্রাহত হবার ভয় থাকে না কারণ বজ্রাঘাতে মৃত ব্যক্তি বজ্রনাদ শোনবার অপেক্ষা রাখে না।

সর্বশেষ যে কথাটি না বললেই নয় তা হল, 'বজ্র' মানব সভ্যতার আশীর্বাদ না অভিশাপ। মেঘ থেকে মাটিতে আসতে বিদ্যুতের এক সেকেণ্ডের লক্ষ্য লক্ষ্য ভাগের চেয়েও কম সময় লাগে (যেখানে বিদ্যুৎ চমকের স্থায়ীত্বকাল কখনো $\frac{1}{100000}$ সেকেণ্ডের বেশি হয় না) মৃত্যু ঘটতে লাগে আরও কম সময়। মৃত্যু যন্ত্রণা বোঝার আগেই আসে মৃত্যু। অনেক সময় বজ্রপাতের জায়গা থেকে এক-শ' বা দুই-শ' হাত দূরের প্রাণীকেও মরতে দেখা যায়। হঠাৎ শারীরিক পরি-বর্তনই এই মৃত্যুর কারণ। অন্যদিকে দেখা যায় বজ্রাহত হয়ে বদ্ধ কালা শ্রবণশক্তি ফিরে পেয়েছে, অন্ধ দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেয়েছে—এই বজ্রপাত যাতে মানব সভ্যতার উপকারে আসে সে ব্যাপারে বহু পরীক্ষা চলছে—এ বিষয়ে একটা আশ্চর্য ঘটনা উল্লেখ করে শেষ করি :—পেরুর "গেলেন ডিন" নামক স্থানে বজ্রপাতের ফলে এক মহিলার অঙ্গ থেকে বস্ত্র খুলে গিয়েছিল অথচ মেয়েটির দেহে বিন্দুমাত্র আঁচড় লাগেনি।—তবে মেয়েটি বাকশক্তি হারিয়ে ছিল।

79A, পিকনিক্ গার্ডেন রোড, কলিকাতা—৩৯ তিলজলা

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের নিয়মাবলী

গ্রাহক ও এজেন্টদের প্রতি

● কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রতি ইংরাজী মাসের গোড়ার দিকে প্রকাশিত হয়।

● প্রতি সংখ্যার মূল্য 5·50 টাকা। বারো মাসের বৈশাখ-চৈত্র (April-March) গ্রাহক চাঁদা—হাতে 45 00, পোস্টে (Under Certificate of Posting) 50·00 টাকা। শারদ সংখ্যার মূল্য পৃথক।

● M O বা Bank Draft KISHORE JNAN BIJNAN-এর নামে পাঠাতে হবে।

● 25 কপির কমে এজেন্সী দেওয়া হয় না। কমিশন শতকরা 25 টাকা।

● ভি. পি. পি বা ব্যাঙ্ক মারফৎ পত্রিকা পাঠানো হয়। সংখ্যাপিছু গ্রাহকদের 1·00 টাকা করে সিকিউরিটি ডিপোজিট রাখতে হবে।

লেকদের প্রতি

● বিদ্যালয় পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রী এবং সর্বসাধারণের উপযোগী যে কোন বিজ্ঞানরচনা কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানে প্রকাশের জন্য পাঠানো যেতে পারে।

● পাতার একদিকে স্পষ্ট হস্তাক্ষরে লেখা পাঠাতে হবে।

● সম্ভাব্য ক্ষেত্রে প্রতিটি রচনার সঙ্গেই ছবি পাঠাতে হবে।

● প্রেরিত রচনা সাধারণতঃ এক বছরের মধ্যে প্রকাশিত না হলে অনুমোদিত হয়নি বলে ধরে নিতে হবে।

● অমনোনীত রচনা ফেরৎ পাঠানো হয় না।

সহজ কথায় রসায়ন

অমরনাথ রায়

[এক]

ভাবের আদান প্রদানের জন্যেই উদ্ভব হয়েছে ভাষার। ভাষার মাধ্যমে আমরা কথা বলি, মনের ভাব লিখে প্রকাশ করি, বিভিন্ন ভাষায় লেখা বই পড়ে আমরা জ্ঞানার্জন ও আনন্দ লাভ করি।

ভাষা অবোর বিভিন্ন রকম, মুদ্রিত গ্রন্থের ভাষা 'শুদ্ধ ভাষা', কথ্য ভাষা অন্য রকম। কথ্য ভাষাতেও অবশ্য গ্রন্থ রচনা করা হতে পারে এবং তা হয়েও থাকে।

ভাষা সাহিত্যের বাহন। সাহিত্যের ভাষার সঙ্গে আমরা সবাই পরিচিত ; কিন্তু সাহিত্যের ভাষা ছাড়াও আরেকটা ভাষা আছে, তার নাম বিজ্ঞানের ভাষা। এ ভাষা সাহিত্যের ভাষা থেকে স্বতন্ত্র। এ ভাষার চলন বিজ্ঞানী বা বিজ্ঞান পড়ুয়াদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এ ভাষা কথ্য ও সাহিত্যের ভাষার তুলনায় সংক্ষিপ্ত অথচ অর্থবহ। বিজ্ঞানের ভাষার শব্দ ভাণ্ডার বাড়তে বাড়তে এমন পর্যায়ে এসে পড়েছে যে এর জন্যে কেবল বিজ্ঞান অভিধানই নয়, বিজ্ঞানের বিশ্বকোষও রচিত হয়েছে।

বিজ্ঞানের ভাষার শব্দ ভাণ্ডারও বিচিত্র। বর্ণ পরিচয় না ঘটলে যেমন কথ্য ও সাহিত্যের ভাষা আয়ত্ত্ব করা যায় না, বিজ্ঞানের ভাষা শিখতে হলেও তার অ, আ, ক, খ জানা বা শেখা দরকার। বলা বাহুল্য এ ভাষার অ, আ, ক, খ আর সাহিত্যের ভাষার অ, আ, ক, খ এর মধ্যে তফাৎ অনেক।

কয়েকটা উদাহরণ দিয়ে সাহিত্যের ভাষা ও বিজ্ঞানের ভাষার পার্থক্য বোঝাবার চেষ্টা করা যাক্ ; বস্তুর ভরের সামান্যতম অংশের লয় ঘটলে তা-ই রূপান্তরিত হয় বিপুল পরিমান শক্তিতে। —এই বক্তব্যটি বিশ্ববন্দিত বিজ্ঞানী অ্যালবার্ট আইনষ্টাইন তাঁর বিখ্যাত সমীকরণ $E=m.c^2$ মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। ভরের শক্তিতে রূপান্তরের এই তত্ত্বটি বুঝতে হলে E, m, c ইত্যাদির অর্থগুলি জানা দরকার। এখানে m হচ্ছে বস্তুর ভর, ভরের রূপান্তরের ফলে উদ্ভূত শক্তি হলো E আর c হলো শূন্য মাধ্যমে আলোকের বেগ।

ছোট্ট একটি সমীকরণ $E=mc^2$; অথচ এটি কতোই না অর্থবহ ! কিন্তু এর অর্থ বুঝতে হলে আগে E, m, c ইত্যাদির অর্থগুলি জানা দরকার। জানা দরকার ভর, শক্তি ইত্যাদি বলতে কি বোঝায়, কারণ এইগুলিই তো বিজ্ঞানের ভাষার অ, আ, ক. খ।

আবার খড়িমাটি বা ক্যালসিয়াম কার্বনেটকে তীব্রভাবে উত্তপ্ত করলে তা ভেঙ্গে গিয়ে পোড়া চুন বা ক্যালসিয়াম অক্সাইড এবং কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন করে।

—এতগুলি কথা রসায়ন বিজ্ঞানীরা রসায়নের ভাষায় সহজ করে বুঝিয়ে দিয়েছেন একটিমাত্র সমীকরণ দিয়ে। আর সেই রাসায়নিক সমীকরণটি হলো ঃ

$$CaCO_3 = CaO + CO_2$$

এক্ষেত্রে এই সমীকরণের অর্থ বুঝতে হলে Ca,C,O ইত্যাদি চিহ্নগুলির এবং $CaCO_3$, CaO, CO_2 ইত্যাদি সংকেতগুলির (রাসায়নিক যৌগের) অর্থ জানা দরকার। আর এগুলি জানার মানেই হলো রাসায়নের ভাষার অ, আ, ক, খ জানা।

বিজ্ঞান অজস্র শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে ছড়িয়ে পড়েছে অনেকদূর। পদার্থ-বিজ্ঞান, রসায়ন-বিজ্ঞান, উদ্ভিদ-বিজ্ঞান, শারীর-বিজ্ঞান, চিকিৎসা-বিজ্ঞান, গণিত-বিজ্ঞান ইত্যাদি বিজ্ঞানের মূল শাখাগুলির প্রত্যেকটি আবার কয়েকটি করে উপশাখায় বিভক্ত। এদের প্রত্যেকটিরই ভাষা আলাদা। আমরা বিজ্ঞানের একটি শাখার ভাষা নিয়েই আলোচনা করতে চাই এই প্রবন্ধে, এবং সেটি হলো রসায়ন বিজ্ঞান। রসায়নের ভাষাই হবে আমাদের একমাত্র আলোচ্য বিষয়। অতএব শুরু করা যাক রসায়নের অ, আ, ক, খ বা বর্ণ পরিচয় থেকে। কিন্তু তার আগে জেনে নেওয়া যাক্ 'রসায়ন' বলতে কি বোঝায়।

আমরা জড় জগতে বিভিন্ন রকমের পদার্থের সংস্পর্শে আসি। এই পদার্থগুলি কিভাবে বা কি দিয়ে গড়া, এদের ধর্ম বা গুণাবলী কি, শক্তি প্রয়োগে এদের কি ধরনের পরিবর্তন ঘটে এবং এদের পরস্পরের মধ্যে ক্রিয়া-বিক্রিয়ার ফলাফল কি-তাই হলো রসায়নের বিষয়বস্তু। সংজ্ঞা দিতে গেলে বলতে হয় ঃ

"রসায়ন শাস্ত্রে জড় পদার্থের গঠন, গুণাবলী, প্রকৃতি, বিশেষ করে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বা শক্তি প্রয়োগে পদার্থের বিভিন্ন পরিবর্তন এবং এক পদার্থের উপর অন্য পদার্থের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার পর্যালোচনা করা হয়।"

রসায়ন শাস্ত্রকে জানতে গেলে পদার্থের গঠন ও নানা রকম পরিবর্তনের বিষয় পড়তে হয়। পদার্থের সম্পূর্ণ নাম লিখে তার গঠন ও পরিবর্তনগুলি সর্বদা প্রকাশ করা অসুবিধাজনক ও সময় সাপেক্ষ। তাই এর সংক্ষিপ্ত উপায় উদ্ভাবন করার প্রয়োজন অনুভূত হয়।

মধ্যযুগের অ্যালকেমিস্ট বা কিমিয়া শাস্ত্রবিদেরা বিভিন্ন রহস্যময় সাংকেতিক চিহ্নের সাহায্যে পদার্থের নাম প্রকাশ করতেন।

প্রাচীন হিন্দু ও গ্রীক জ্যোতির্বিদেরা আবার ধাতুর সঙ্গে বিভিন্ন জ্যোতিষ্কের কল্পনা করে জ্যোতিষ্কের বিভিন্ন সাংকেতিক চিত্রকে ধাতুর প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করতেন। যেমন :

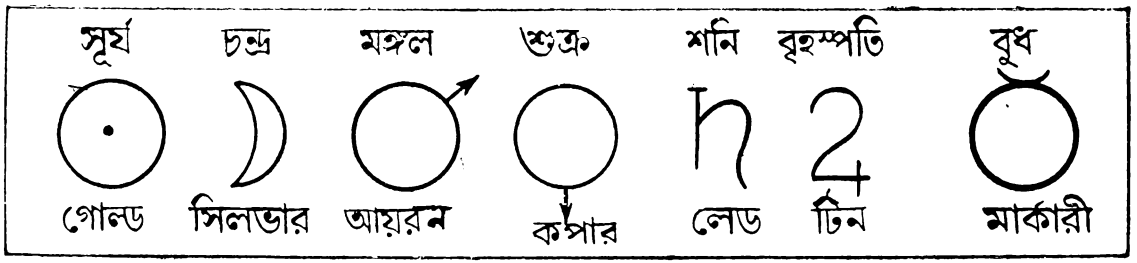

ধাতুর প্রাচীন প্রতীক

সাংকেতিক চিত্রের সাহায্যে বিভিন্ন পদার্থের নাম প্রকাশ করার এই পদ্ধতি ছিল খুবই জটিল। সেই জটিলতাকে দূর করার কাজে প্রথম এগিয়ে আসেন প্রখ্যাত ইংরেজ রসায়ন শাস্ত্রবিদ 'জন ডালটন' (খ্রীঃ 1766—1844)।

জন ডালটন জটিল চিত্রের বদলে অপেক্ষাকৃত সরল চিত্রের প্রবর্তনে সচেষ্ট হন। কিন্তু তিনি যে প্রণালীতে পদার্থগুলিকে চিহ্নিত করেছিলেন তাও সহজবোধ্য ছিল না। তাই এর পরিবর্তনের প্রয়োজনও অনুভূত হলো।

তারপর 1811 খ্রীষ্টাব্দে এ কাজে এগিয়ে এলেন এক সুইডিস রসায়ন বিজ্ঞানী। নাম তাঁর 'জোন্স জেকব বার্জেলিয়াস' (খ্রীঃ 1779-1848)। তিনিই সর্বপ্রথম একটি সহজ পদ্ধতিতে মৌলিক পদার্থগুলির পূর্ণ মান সংক্ষেপে প্রকাশ করেন। প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞানী বার্জেলিয়াসই আধুনিক রাসায়নিক চিহ্নের প্রবর্তক। আজও পৃথিবীর সর্বত্র বার্জেলিয়াস প্রবর্তিত পদ্ধতি প্রচলিত আছে।

কোন মৌলিক পদার্থের পূর্ণ নাম যা দ্বারা সংক্ষেপে প্রকাশ করা হয় তাকে চিহ্ন বা প্রতীক বলে। এই চিহ্ন বা প্রতীক প্রকাশের উপায় একটি নয়, একাধিক। তবে (i) সাধারণতঃ মৌলিক পদার্থের ইংরেজী নামের প্রথম অক্ষরটি (আদ্যক্ষরটি) ইংরেজী বড় অক্ষরে লিখে মৌলের চিহ্ন হিসাবে ব্যবহার করা হয়। যেমন :

মৌলের ইংরাজী নাম		চিহ্ন
হাইড্রোজেন	(Hydrogen)	H
অক্সিজেন	(Oxygen)	O
নাইট্রোজেন	(Nitrogen)	N
কার্বন	(Carbon)	C
সালফার	(Sulphur)	S
ফসফরাস	(Phosphorus)	P
বোরন	(Boron)	B
আয়োডিন	(Iodine)	I

(ii) অনেক সময় একাধিক মৌলিক পদার্থের ইংরেজী নামের প্রথম অক্ষর বা আদ্যক্ষর একই হয়। যেমন, কার্বন (Carbon) ও ক্লোরিন (Chlorine) উভয়ের ইংরেজী নামেরই আদ্যক্ষর C ; আবার বোরন (Boron) ও বেরিয়াম (Barium) উভয়েরই ইংরেজী নামের আদ্যক্ষর B ; এ সব ক্ষেত্রে এদের একটিকে ইংরেজী নামের বড় আদ্যক্ষরের সঙ্গে আরেকটি ছোট অক্ষর যুক্ত করে চিহ্নিত করা হয়। যেমন :

মৌলের ইংরাজী নাম		চিহ্ন
বোরন	(Boron)	B
বেরিয়াম	(Barium)	Ba
ব্রোমিন	(Bromine)	Br
বিসমাথ	(Bismuth)	Bi
বেরিলিয়াম	(Beryllium)	Be
কার্বন	(Carbon)	C
ক্লোরিন	(Chlorine)	Cl
ক্যালসিয়াম	(Calcium)	Ca
কোবাল্ট	(Cobalt)	Co
ক্যাডমিয়াম	(Cadmium)	Cd

[ক্রমশঃ]

সার্কিট ডায়াগ্রামের সাংকেতিক রূপ

অনুপম দে

মডেল তৈরি করতে গিয়ে অসুবিধায় পড়া বেশীর ভাগ নূতন শিক্ষার্থীর নিকট স্বাভাবিক ব্যাপার। তাদের সবচেয়ে অসুবিধার কারণ হ'ল সার্কিট ঠিকমত বুঝতে না পারা। এখন বেশির ভাগ সার্কিটেই ইলেকট্রনিক্স উপকরণগুলির সাংকেতিক রূপ আঁকা থাকে তাই নিচের সাংকেতিক রূপগুলি মনে রাখলে আশা করি তাদের অসুবিধায় পড়তে হবে না।

1 রেজিস্টর (Resistance) বা রোধ :

রেজিস্টর-এর কাজ হ'ল সার্কিটে তড়িৎ-প্রবাহ কমানো। ইহার মাপের একক হইল ওহম। ইহা 'Ω' চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ করা হয়। ইহাদের প্রকার ভেদে সংকেত বিভিন্ন হয়। নিম্নলিখিত সংকেতগুলি রেজিস্টরকে বোঝাবার জন্য ব্যবহৃত হয়।

সাধারণ ফিক্সড রেজিস্টর :

ভ্যারিয়েবল বা পরিবর্তনশীল রেজিস্টর :

L. D. R বা আলোক নির্ভর রেজিস্টর :

এছাড়া আছে থার্মিস্টর। ইহা সাধারণ রেজিস্টর এর মতই চিহ্ন দ্বারা প্রকাশিত হয়। তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে এর রোধ বদলে যায়।

2. ডায়োড :

ডায়োডের মধ্য দিয়ে তড়িৎ-প্রবাহ মাত্রা এক দিকেই প্রবাহিত হয়।

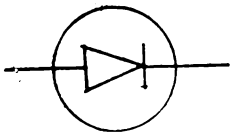

সাধারণ ডায়োড—

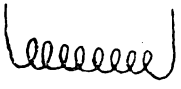

কয়েল

L. E. D বা আলোক বিচ্ছুরণ ডায়োড—

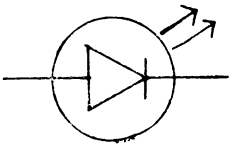

3. ট্রানজিস্টর :

ইলেকট্রনিক্স উপকরণগুলির মধ্যে ট্রানজিস্টর একটি প্রধান উপকরণ। প্রবাহমাত্রাকে কণ্ট্রোল করতে এর কাজ অতি গুরুত্ব পূর্ণ।

NPN টাইপ

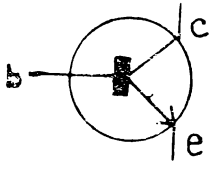

PNP টাইপ

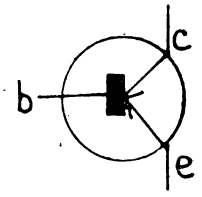

4. অন্যান্য উপকরণ সমূহের চিহ্ন :

ভ্যারিয়েবেল কণ্ডেন্সার

লাউড স্পীকার

কণ্ডেন্সার

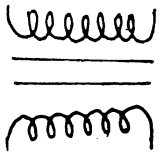

ট্রান্সফরমার

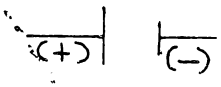

ব্যাটারী

আর্থ

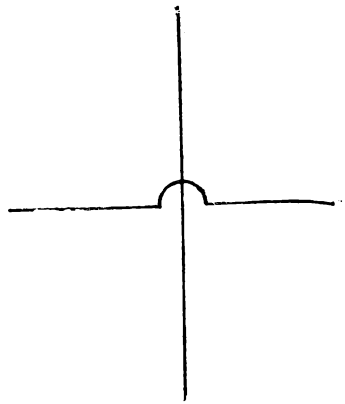

দুটি তারের মধ্যে সংযোগ নাই

এরিয়্যাল

চেসিস

রঘুনাথপুর, পুরুলিয়া-723133।

মডেল

মডেলের রকমফের

নির্মলেন্দু বিকাশ পাত্র

টাচ সেনসেটিভ সুইচ

[চার]

টাচ সুইচের Circuit তোমরা আগেও দেখেছ কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞানের পাতায়। তবে একেবারে Circuit-এর বৈশিষ্ট্য হল যে এটা Touch করে on এবং off দুটো কাজই করা যেতে পারে।

সাধারনতঃ CMOS Gate-এর input impedence অত্যন্ত high হয়। CMOS-এর এই বৈশিষ্ট্যকে কাজে

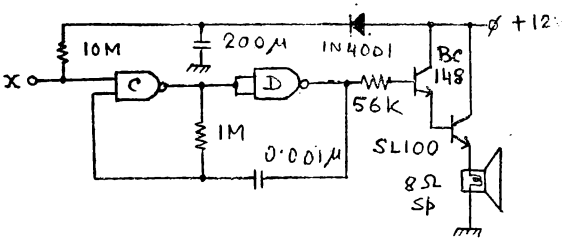

লাগিয়ে এখানে Touch switch তৈরি করা হয়েছে। Circuit-এর মধ্যেই একটা FLIP-FLOP করা হয়েছে যার ফলে ON/OFF দুটো কাজই করা যাচ্ছে। লক্ষ্য করলেই দেখতে পাবে যে Touch plate-এর জায়গায় তিনটি plate আছে। এই প্লেটটা বিশেষভাবে তৈরি করতে হবে। প্রথমেই তামার একটা পাতলা পাত গোল করে কেটে নাও। তারপর ঐ পাতটা ছবির মতো করে তিনটে ভাগে ভাগ করে নাও। এবার পাশাপাশি বা লম্বালম্বি টুকরোগুলি সাজিয়ে গোল আকার দাও, তবে খেয়াল রাখবে যাতে কখনোই একটা পাত আরেকটার সাথে ঠেকে না যায়। এবার তিনটে পাতের নীচে থেকে ঝালাই করে Cennection নিয়ে পুরো পাতের সেটটাকে কোন কাঠ বা যেখানে ইচ্ছা সেখানে আঠা দিয়ে আটকে দাও।

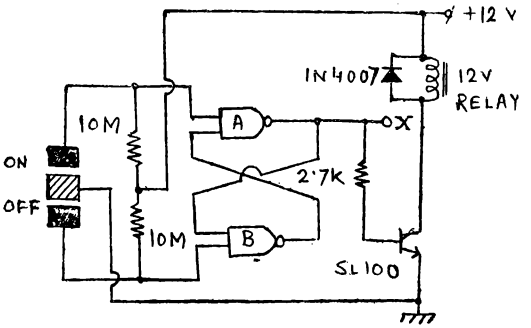

এই টাচ সুইচের সাহায্যে সরাসরি তোমরা Relay অথবা Siren drive করতে পারো। পাশে দেওয়া horn Circuitটা তোমরা এজন্য ব্যবহার করতে পারো। দুটো সার্কিটেই দুটো করে Gate use করা হয়েছে, কাজেই সম্পূর্ণ সার্কিটটা করতে মোট একটা IC-ই লাগবে।

গ্রাম + পোস্ট ঃ চামরাইল, হাওড়া-711323।

বিচিত্র জীবজন্তু

ফ্লাইং সোয়ার্ম

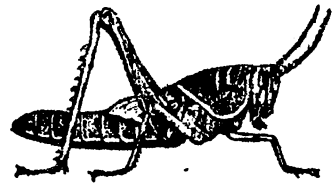

সলিল রাহা

প্রসঙ্গ "ডেসার্ট লোকাস্ট" (পঙ্গপাল)—যার বৈজ্ঞানিক নাম Schistocerca gregaria, Forsk অর্থোপটেরা (Orthoptera) বর্গের অন্তর্গত। প্রায় সব-রকম কৃষিজাত ফসলের উদ্ভিদ ও বন্য উদ্ভিদের ভয়ঙ্কর ক্ষতিসাধনকারী পতঙ্গদের তালিকায় এরা অন্যতম। গুরুতর কীটশত্রু (Pest) রূপে গণ্য পুরানো এই পতঙ্গের ব্যাপ্তি সুদূরপ্রসারী। প্রচুর সংখ্যায় বংশবৃদ্ধি করে দলবদ্ধভাবে মাইলের পর মাইল ধরে ক্ষেতের আক্রমণ সাধনে এদের জুড়ি আর কেউ হয় না।

গঙ্গাফড়িং-এর ঘনিষ্ঠতম হলেও এদের বিশেষ কতকগুলি বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। এরা প্রচুর সংখ্যায় উপযুক্ত পরিবেশে একত্রিত হয়। অপরিণত দৃশ্যগুলির দেহ-বন্ধনযুক্ত এবং পরিণত দশায় "ফ্লাইং সোয়ার্ম" উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যের দাবী রাখে। সাধারণ ভাবে দলবদ্ধভাবে যারা আক্রমণ করে এদের দেহের বর্ম হলুদ অথবা গোলাপী রঙের হয় এবং সুস্পষ্ট বন্ধনযুক্ত। অথচ একক দশাদের বর্ম পরিবেশের উদ্ভিদের উপর নির্ভরশীল। তবে, সাধারণ ভাবে ধূসর বর্ণের হয়। দেহের রঙ ছাড়া অঙ্গস্য স্থানিকেরও কিছু কিছু পার্থক্য লক্ষ্যণীয়। যেমন, দলবদ্ধ ভাবে আক্রমণ কারীদের চোখের উপরে 7টি দাগ ও 26 খণ্ডকযুক্ত শুড় এবং তুলনামূলক ভাবে একক আক্রমণকারীদের 6টি, কখনও 4টি দাগ ও কমসংখ্যক খণ্ডকযুক্ত শুঁড় দেখা যায়।

এদের জীবন ইতিহাসও বৈচিত্র্যময়। স্ত্রী পঙ্গপাল মিলনের পরই গর্তের মধ্যে (ভিজা বালুমাটিতে) প্রায় 50-100টি ডিম প্রসব করে। ডিম প্রসবের পর স্ত্রী পঙ্গপাল এদের দেহনিঃসৃত আঠালো পদার্থ দিয়ে গর্তের মুখ বন্ধ করে দেয়। বসন্তকালে ডিম ফুটিতে প্রায় 3-4 দিন এবং গ্রীষ্ম-কালে প্রায় দু'সপ্তাহ সময় নেয়। ডিম ফুটে সদ্যোজাত ডানাবিহীন "হপারস" বের হয় এবং উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশ যত্রতত্র ভক্ষণ করতে শুরু করে। এরা প্রথমদিকে কালো বর্ণের হয় এবং বৃদ্ধির সাথে সাথে 3-5 দিনের মধ্যে খোলস পরিত্যাগ করে। খোলস ত্যাগ করবার পরপরই এদের দেহের বর্ণও পরিবর্তিত হতে থাকে। পূর্ণাঙ্গ দশার প্রথম দিকে এদের গোলাপী রঙের হতে দেখা যায় এবং জনন দশায় প্রাপ্ত হলে উজ্জ্বল হলুদ বর্ণ ধারণ করে। পঙ্গপালের পূর্ণাঙ্গের আগের দশার সম্পূর্ণ সময়কাল বসন্তকালে ছয় সপ্তাহ এবং গ্রীষ্মকালে চার সপ্তাহ। তবে, লক্ষ্যণীয় গোলাপী বর্ণের পূর্ণাঙ্গই কৃষিজাত ফসলের বেশি ক্ষতি করে।

পঙ্গপালের বিস্তৃতি ভারতবর্ষের রাজস্থান হতে শুরু হয়ে পাকিস্তান, আরব এবং মধ্য এশিয়ার দেশ গুলি হয়ে পূর্ব-আফ্রিকা, সুদান এবং উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকাতে দেখা গিয়েছে। দলবদ্ধ ভাবে এদের আক্রমণ আফ্রিকা মহাদেশের সর্বত্র, পারসিয়া, প্যালেস্তাইন, রাশিয়া, আফ্‌গানিস্তান, প্রভৃতিদেশে লক্ষ্য করা গিয়েছে। ভারতবর্ষে একক দশার আক্রমণ রাজস্থান, বরোদা, সৌরাষ্ট্রের কিছু অংশ, পঞ্জাব ও হরিয়ানার কিছু অঞ্চলেই সীমিত। কিন্তু দলবদ্ধভাবে এরা সমগ্র উত্তর-পশ্চিমের এলাকা ও উত্তরের পাহাড়ী অঞ্চলে এবং দক্ষিণের মাদ্রাজ অঞ্চলে পৌঁছায়। দলবদ্ধ অবস্থায় এরা বেশি সক্রিয় এবং অল্প সময়ে প্রচুর সংখ্যায় বংশবৃদ্ধি করে "সোয়ার্ম" (Swarm) গঠন করে। ঝাঁকে ঝাঁকে এদের "সোয়ার্ম" সমুদ্র উপকূলের প্রায় 12000 মাইল জুড়ে লক্ষ্য করা গিয়েছে।

"ডেসার্টলোকাস্ট"-এর প্রাদুভাব সম্পর্কিত অতি আধুনিক গবেষণায় জানা যায় যে এদের অনেকটা যায়গা জুড়ে "নিভৃতাবাস"কে ঘিরে যাকে "আক্রমণ অঞ্চল" এবং প্রথোমোক্ত অঞ্চলে এককভাবে সব সময়ই বিরাজমান। দলবদ্ধ ভাবে বসবাসকারী পঙ্গপালদের উৎপত্তি "আক্রমণ অঞ্চলের" যে কোন জায়গাতেই হতে পারে এবং প্রতিকূল অবস্থায় "নিভৃতাবাসে" যারা বেঁচে থাকে উপযুক্ত পরিবেশ পেলেই তারাই নতুনভাবে "সোয়ার্ম" গঠন করে। যদিও পঙ্গপাল উপোরোক্ত দুটি অঞ্চলেই থাকে তথাপি এদের অবস্থান পরিবর্তন বিশৃঙ্খল নয়। তার কারণ সব অঞ্চলই এদের জনন প্রক্রিয়ার উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি হয় না। বিশেষ করে, এই প্রজাতির ক্ষেত্রে পরীক্ষালব্ধভাবে জানা গিয়েছে যে ডিমের ক্রমবিকাশে আদ্রতা খুবই সঙ্কটময় এবং সুব্যবস্থাও সহজসাধ্য হয় না। প্রকৃতিতে "আক্রমণ অঞ্চলের" সোয়ার্ম নির্দিষ্ট অঞ্চলে অনুপ্রবেশ করে তখনই, যখন ঐ অঞ্চলের পরিবেশে আদ্রতা অনুকূলে থাকে এবং সেখানেই সংখ্যাধিক্য ঘটে। এই ভাবেই বহু বছর সোয়ার্ম গঠন চলতে থাকে। এদের "সোয়র্মি" চক্রাকারে হয় এবং বিভিন্ন সময়ের দূরত্বে কিছুদিন অন্তর অন্তর পরিবেশের প্রভাবে বিস্তার লাভ করে। ভারতবর্ষে এদের আক্রমণ ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুতেই দেখা গিয়েছিল এবং বেশ কয়েক বারের উপদ্রব (1940-46,

1951-'55 এবং 1962-63) মারাত্মক রূপ নিয়েছিল বলে জানা যায়।

পঙ্গপাল দমনের জন্য অন্যদেশের মত ভারতবর্ষেও 'Anti Locust Organization' গড়ে উঠেছে প্রথম থেকেই। যেহেতু এরা বিশেষ কোন ফসলের নির্দিষ্ট কীট-শত্রু বলে বিবেচিত নয় এবং সেই কারণে সম্পূর্ণ বিষয়গুলি রাজ্যের সংস্থাকে দেখাশুনা করতে হয়। এদের দমনের জন্য তাই দুটি গুরুত্বপূর্ণ দিকে জোর দেওয়া হয়। যেমন, প্রথমত দমনের কার্য পরিচালনা সম্পর্কিত এবং দ্বিতীয়ত বিভিন্ন দমন পদ্ধতির সুষ্ঠু ব্যবহার। তাই ধ্বংস সাধনের জন্য এদের বিভিন্ন অঞ্চলে অনুপ্রবেশের বিবরণের উপর ভিত্তি করে করে দমনের উপায় গুলি ভাবা হয়। পাকিস্তান, ইরান ও অন্যান্য কয়েকটি দেশ হতে পঙ্গপালের নিয়মিত বিস্তৃতির বিবরণ পাওয়ার জন্য ভারতবর্ষেও এই ধরণের ব্যবস্থা রয়েছে। এই সংস্থা দেশের বিভিন্ন রাজ্যগুলিতে পঙ্গপাল বিস্তৃতির খবরাখবর প্রেরণ করে।

গ্রীষ্মকালে "সোয়ার্মিং"-এর সময় সতর্ক রেখে এদের

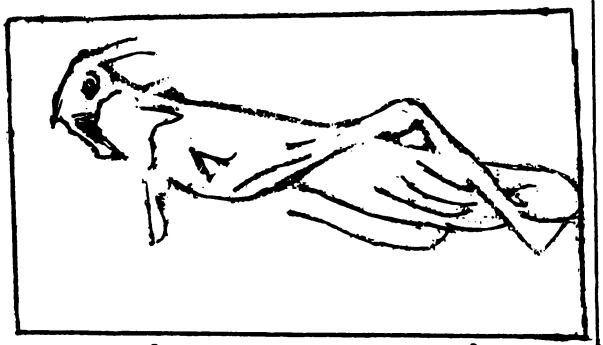

আক্রমণের প্রতিরোধক ব্যবস্থা নেওয়া হয়। সক্রিয় পঙ্গপাল গুলি রাতে ফসলের উপর আশ্রয় নেয় এবং এই সময়ে বিভিন্ন ভাবে শব্দ সৃষ্টি করে এদের বিরক্ত করলে দূরে অন্যত্র চলে যায়। এছাড়া বিভিন্নভাবে ধোঁওয়া সৃষ্টি করে এদের হাত হতে পরিত্রাণ পেতে হয়। বিভিন্ন কীটনাশক যেমন, Dieldrin, Lindane gratules ইত্যাদি ব্যবহার করে—অপরিণত ও পূর্ণাঙ্গ দশার দমন করা হয়। যেহেতু কয়েক মাইল জুড়ে এদের আক্রমণ থাকে সেই কারণে উন্নতিশীল দেশগুলিতে আকাশ পথে বিমান হতেই কীটনাশক ছড়ানোর ব্যবস্থা করে। আবার কখনও "বিষাক্ত পদার্থের টোপ" প্রতি একর জমিতে 20-30 পাউণ্ড হারে ব্যবহার করেও এদের দমন করা যায়। পঙ্গপালের প্রাকৃতিক শত্রু বলতে কয়েকটি পাখির উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন—ময়না, স্টারলিং, এদের বিভিন্ন দশাগুলি ভক্ষণ করে থাকে। তাই এই প্রসঙ্গে এদের সুনিশ্চিত সংরক্ষণে পঙ্গপাল দমনে এদেরও উল্লেখ-যোগ্য ভূমিকা দেখা যেতে পারে।

প্রাণবিদ্যা বিভাগ, রহড়া. উত্তর 24-পরগণা।

কীটপতঙ্গের গল্প

ডাঁশ-মৌমাছি

ধীরেন দত্ত

সন্দেশখালিতে একদিন একটা উড়ো চিঠি পেলাম। নাইনিতাল থেকে লিখেছেন ডক্টর এস. কাউলে (Dr. S. Cowley)। আমার নাম ও ঠিকানা তিনি কোথায় পেলেন, এটাই আশ্চর্যের বিষয়! নইনিতালের উত্তরে হিমালয়ের তিন হাজার ফিটের ওপারে জঙ্গলে তিনি কস্তুরী হরিণদের নিয়ে গবেষনা করেন।

সুন্দরবনে কস্তুরী হরিণ নেই, তিনি আমাকে যে পত্র দিয়েছেন তার বিষয়বস্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন। তিনি লিখেছেন, হিমালয়ের তিন হাজার ফিটের উপরের জঙ্গলে যে ডাঁশ-মৌমাছিরা (Apis Dorsata) ডিসেম্বর জানুয়ারীতে চাক বাঁধে তারাই কি মে-জুন মাসে সুন্দরবনে মাইগ্রেট করে এবং চাক বাঁধে ও মধু সঞ্চয় করে? প্রতি বছর মে-জুন মাসে সুন্দরবনে ডাঁশ-মৌমাছিরা চাক বাঁধে ও মধু সঞ্চয় করে সত্য, কিন্তু ওরা হিমালয় থেকে মাইগ্রেট করে কিনা, তা আমার জানা ছিল না। এ বিষয়ে কলকাতার জুলজিকাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার কয়েকজন গবেষকের সাথে কথা বললাম, কিন্তু কারও কাছে সঠিক কোনো তথ্য পেলাম না। সুন্দরবনের জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে ডাঁশ-মৌমাছিদের চাক দেখেছি, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড চাকে মধু ভর্তি, জুন-জুলাই মাসে এক শ্রেণীর লোক তাদের বলা হয় মৌখে বা মৌখী. তারা ঐ সমস্ত চাক থেকে মধু নিংড়ে নিয়ে চলে যায়। কিন্তু সেপ্টেম্বরে দেখেছি, ডাঁশ মৌমাছিরা চাক ছেড়ে কোথায় উধাও হয়েছে, একটা চাকে মাছি নেই, এই ছোট ছোট প্রাণীরা কি হাজায় হাজার মাইল পাড়ি দিয়ে হিমালয়ে যাওয়া-আসা করতে পারে? এটা একটা রহস্যের ব্যাপার নয় কি?

একবার, শ্রী কল্যাণ চক্রবর্ত্তী তখন সুন্দরবনের টাইগার রিজার্ভের ফিলড ডাইরেক্টার, আমরা বড় বড় কয়েকটা বাকসো তৈরি করে রাণী-মৌমাছি সহ কিছু ডাঁশ-মৌমাছিকে আটক করে, বাকসের মধ্যে মধু উৎপাদনের প্রচেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু এই সমস্ত বুনো-মৌমাছিরা আটক থাকতে কিছুতেই রাজি হল না, আমাদের সমস্ত প্রচেষ্টাই বিফল

হলো। সুন্দরবনের বসতি এলাকার শত শত অভাবী মানুষ প্রতি বছর পাশ নিয়ে জঙ্গলে ঢেকে চাক নিংড়ে মধু আনতে, তাদের বলা হয় মৌল বা মৌলী। সাধরণত তারা একজন দলপতি বা বাউলের অবিভাবকত্বে জঙ্গলে ঢোকে। বাউলে একটা নৌকা সুবিধা মত স্থানে চাপান রাখে যেখানে মধুর সঞ্চয় হয়, তাকে বলা হয় ভড়। সারাদিন জঙ্গলে মধু সংগ্রহ করে সকলে সন্ধ্যার আগেই ভড়ে ফিরে এসে সমবেত হয়।

সেবার আমি সূর্য্য বাউলের দলে, ছিলাম। এই দলটা নিয়ে প্রতি বছর সূর্য্য বাউলে, জঙ্গলে খেত মৌভাঙতে। আমাদের দলে ছিল কালু বলে একটা ছেলে, খুব সাহসী ও তাগড়াই। কালু নতুন বিয়ে করেছে তাই এ বছর ও জঙ্গলে যেতে অনিচ্ছুক। ওর নতুন বৌ সূর্য্য বাউলেকে ডেকে বলেছে, শোনো তো বাপু, আমার সোয়ামিকে যদি কলে টানতি চাও, তাহলে তোমার খেতো মুখ ভোতা করে দেবো জেনো! আমার সোয়ামি এবার জঙ্গলে যাবে না। সূর্য্য বাউলে কিন্তু চুপ করে নেই দল তৈরি করে নিল, আমাকে নিয়ে ওর দলে এবার ছয়জন। দলে এবার নতুন জুটেছে ভুতো বলে একটা ছেলে, ওর একটা বদনাম আছে ও নাকি ডাকাতি করে, ওর নাকি একটা চোরাই বন্দুকও আছে তার নাকি কোনো লাইসেনস্ নেই। পুলিশের খাতায় ওর নাম আছে। ঐ বন্দুকটার জন্যই বিশেষ করে সূর্য্য বাউলে ওকে দলে রাখতে এত আগ্রহী। বৈশাখী পূর্ণিমতে মা বনবিবির পূজো দিয়ে আমরা জঙ্গলের দিকে রওনা দেব। দিন যত এগিয়ে আসতে লাগল, আমরা তোড়জোড় করতে লাগলাম। বৈশাখী পূর্ণিমার রাতে পাটখালির চড়ায় আমাদের পূজা আরম্ভ হল, রাত তখন 11টা। বিছানায় শুয়ে কালু এ পাশ ও পাশ করছে, শুয়ে শুয়ে পূজোর ঝাঁজ ঘণ্টাধ্বনি শুনতে পাচ্ছে, ঘরের চালে খড় নেই, শুয়ে শুয়ে আকাশের চাঁদ দেখা যায়, বৌয়ের পরনে একটা ছাড়া দুটো কাপড় নেই। আসছে শীতে বাবাকে একটা কম্বল কিনে না দিলে নয়! অথচ গ্রামে কাজ নেই, কোথা থেকে হবে এই সব, যদি জঙ্গলে যাওয়া যেত হয়ত এক দেড় হাজার টাকা পাওয়া যেত! কালু পাশা ফিরে দেখে ওর বৌ সৈরভী পাশে, অঘোরে ঘুমুচ্ছে, ও আস্তে আস্তে উঠে দাড়াল, সৈরভীর কোনো সাড়া শব্দ নেই, তারপর আড়া থেকে জামাটা টেনে নিয়ে হন্ হন্ করে হেঁটে চলল কাটখালীর দিকে, যেখান থেকে ভড় ছাড়ার কথা। ভড়ে উঠে পা ঝুলিয়ে কাদা ঘুতে লাগল, সমস্ত দলটা আনন্দে হৈ হৈ করে ওঠে। ভুতোটা হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ে। এই ছেলেটা যখন হাসে, তখন ওর কুৎসিৎ মুখ আরও কুৎসিৎ দেখায়। সুন্দরবনে সাধারণত আমরা তিন জাতের মৌমাছি দেখতে পাই, এক রকম খুদে খুদে, পিঁপড়ের মত মৌমাছি তারা গাছের কোটরে ছোট চাক বানায়. তাদের এক একটা চাকে, এক-দু ছটাক মধু থাকে। তাদের বলা হয় এপিস্ ফ্লোরিয়া (Apis florea)। আর এপিস ইণ্ডিকা (Apis Indica) ওরা একটু বড় ধরনের চাক বলিয়া ওদের চাকে এক আধ কিলোগ্রাম মধু হয়, আর এপিস্ ডরসাটা (Apis Dorsuta) বড় বড় ডাঁস মৌমাছি, বড় বড় প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড চাক বানায়। ওদের এক একটা চাকে পনেরো ষোল কুড়ি কেজির মত মধুর সঞ্চয় থাকে। ওদের হুলেও তেমনি বিষ ভর্তি। চাকের কাছে গেলেই ঝাঁকে ঝাঁকে তাড়া করে। তখন পালানো ছাড়া অন্য পথ থাকে না।

আমাদের ভড় বায়মঙ্গল ফেলে, গরানখালীতে এসে পড়ল তারপর বাঁয়ে ঘুরে আমরা কালা জঙ্গলের দিকে চললাম। বাউলে স্থান নির্বাচন করে একস্থানে নোঙর করলেন। রোজ সকালে পান্তা খেয়ে আমরা জঙ্গল-কুড়োতে নামলাম, জঙ্গলে মৌচাকের সন্ধান করাকে আররা জঙ্গল-কুড়ানো বলি। এক এক দলে তিনজন করে থাকতাম, ফাঁক ফাঁক হয়ে, এক প্রান্ত থেকে সমস্ত এলাকায় গাছে গাছে, কোথায় মৌচাক হয়েছে, আমাদের চোখ থাকবে গাছের ওপর, কোথায় একটা মৌমাছি বসে আছে, আমরা তন্নতন্ন করে খুজতাম, মৌমাছির গতিবিধি দেখে দেখে আমরা চাকের সন্ধান করতাম, গাছের মাথায় আমাদের নজর, হয়ত সাপের ঘাড়ে পা পড়বে, সাপে পায়ে কাটলে মৃত্যু, কোথায় হয়ত বাঘ থাপটি মেরে বসে আছে, টুক্ করে একজনকে মুখে নিয়ে জঙ্গলে ঢুকে গেলে কেউ টেরই পাবে না, তাই জঙ্গলে মৌলেদের জীবন খুবই বিপদ সঙ্কুল, প্রতি বছর যত লোক বাঘের হাতে বা সাপে কেটে মারা যায় তার অধিকাংশই মৌলে।

প্রায় মাসখানেক হল আমরা জঙ্গল কুড়োচ্ছি, এবার আমাদের ভাগ্য ভাল, প্রচুর মধু সংগ্রহ হয়েছে, এক একজনের ভাগে ভাল টাকাই আসবে। সেদিন জঙ্গলের কাজ সেরে আমি ভড়ে ফিরছি, হঠাৎ বাঁদিকে গুড়ুম করে বন্দুকের শব্দ পেলাম, ভুতোটা হয়ত কিছু একটা ঘটিয়ে বসেছে, তাই শব্দ লক্ষ্য করে আমি এগিয়ে চললাম। কিছুটা গিয়ে দেখি একটা হরিণ শাবক মেরেছে ভুতো। মৃত হরিণ শিশু মাটিতে পড়ে আছে, তার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে, সেই করুণ দৃশ্য দেখে আমি স্থির থাকতে পারিলাম না, তাড়াতাড়ি ভড়ে ফিরে এলাম। ভুতো হরিণের ছাল ছাড়িয়ে মাংস কুচিয়ে রাতের রান্না চাপিয়ে দিল। রাতে হরিণের মাংস আর ভাত খাচ্ছিল ওরা আর আনন্দে হৈ চৈ করছিল, কুপির আলোয় ভুতোর কুৎসিৎ মুখখানা আরব কুৎসিৎ দেখাচ্ছিল, আমি না খেয়ে গলুইতে চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লাম।

পরদিন সকালে পান্তা খেয়ে আমরা জঙ্গলে নামছি, আজই আমাদের জঙ্গলে কুড়ানোর শেষ দিন, কাল আমরা দেশে ফিরব, তাই ভারি আনন্দ লাগছিল একদলে আমরা চারজন, বাউলে নিজে, আমি, কালু আর ভুতো। যে জায়গাটা ছাড়ছিল, সেখানটাতেই আমরা জঙ্গল কুড়োতে লেগে যাই, সারাদিন তন্নতন্ন করে করে চাকের সন্ধানে ঘুরছি, দুপুর হয় হয়, এমন সময় ভুতোর হাঁক শুনলাম, সাঙ্কেতিক ভাষায় সে জানাচ্ছে, চাক পেয়েছে, শব্দ লক্ষ্য করে আমি ঐ দিকে ছুটলাম, ওখানে গিয়ে দেখি, প্রকাণ্ড চাক। বাউলে কালু ভুতো সবাই ওখানে হাজির। ঠিক হল, হেঁতালের লগিতে শুকনো পাতা জড়িয়ে, মশাল তৈরি করে, আগুন লাগিয়ে বাউলে মাছি তাড়াবে, আমি আর কালু গাছে উঠে চাক কাটবো, ভুতো তলায় ধামা ধরবে, যাতে চাক মাটিতে পড়ে, কাদা ধুলো না মখে। সেই মত হেঁসো নিয়ে আমি আর কালু গাছে উঠলাম, বাউলে মশালে আগুন দিয়ে মাছি তাড়াতে ব্যাস্ত, হঠাৎ বনভূমি প্রকম্পিত করে ভয়ঙ্কর বাঘের গর্জন শোনা গেল, আমার হাত থেকে হেসোটা কোথায় যে ছিটকে পড়ল! আমার সামনে দিয়ে যেন হলদে মত একটা ঝলক খেলে গেল। লাফ দিয়ে গাছ থেকে নেমে, নিজেদের মধ্যে গোনাগুনতি করে দেখা গেল ভুতো নেই, ওকে বাঘে নিয়ে গেছে! ওর বন্দুকটা পাশেই কাদার ওপর পড়ে রয়েছে, পড়ন্ত রোদে ব্যারেলটা চক্‌চক্ করছে।

এবার ডক্টর কাউলের প্রসঙ্গে আসি, নানা স্থানে সংবাদ নিয়ে যখন, ডাঁস-মৌমাছি সম্বন্ধে বিশেষ কোনো তথ্য জোগাড় করতে পারলাম না, তখন আমার মাথায় একটা পরিকল্পনা এল, মরশুমে আমি সুন্দরবনের চাক থেকে ডাঁস মৌমাছি ধরব আর ওদের প্রত্যেকটির প্রত্যেকটির পাখায় কালো ফুটকি দিবে ছেড়ে দেব, আর কাউলে হিমালয়ের চাক থেকে মৌমাছি ধরবেন, এবং ওদের পাখায় হলদে ফুটকি দিয়ে ছেড়ে দেবেন, পরের মরশুমে আবার আমরা উভয়েই নানা স্থানে মৌমাছি ধরব। তখন দেখা যাবে কোথাকার মৌমাছিরা কোথায় যায়। আমার পরিকল্পনার কথা জানিয়ে মিঃ কাউলেকে চিঠি দিলাম উনি আমার পরিকল্পনা সমর্থন করে উত্তর দিলেন।

সেই মত আসে টাইগার বিজার্ভের বসির হাট রনজের রেনজ অফিসার দীপেন বসুর সাথে কথা বললাম, উনি খুব উৎসাহের সাথে আমাকে সাহায্য করতে রাজি হলেন, এবং উনি খুব উৎসাহের সাথে আমাদের জন্য তিনটে চাক সাফা করলেন, চাকের কাছে খুটি পুতে তাতে সাদা রং লাগিয়ে তার গায়ে সাইনবোর্ড টাঙিয়ে দিলেন। তাতে লিখে দিলেন, "এই চাকে কেউ হাত লাগাবে না" বৃটিশ পেইন্টসের পরামর্শমত কালি কিনে নিয়ে আমরা জঙ্গলে গিয়ে সাফা করা তিনটে চাক থেকে ছ'হাজার ডাঁস-মৌমাছি ধরলাম, এবং

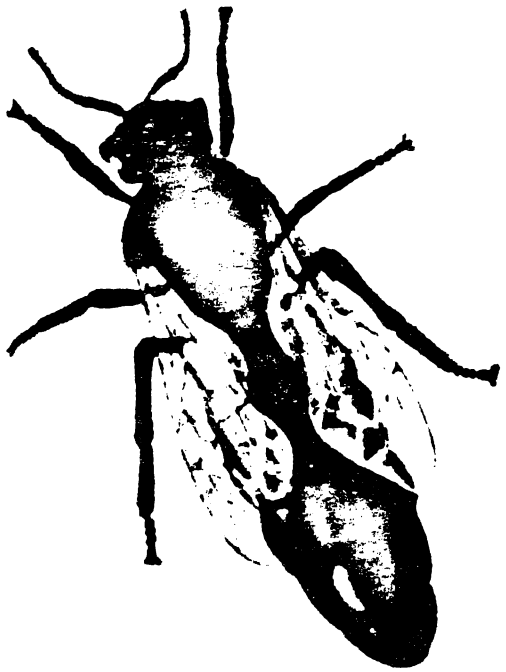

তাদের প্রত্যেকের পাখার কালির ফুটকি দিয়ে ছেড়ে দিলাম। এই ব্যাপারটা আমি মিঃ কাউলেকে জানিয়ে দিলাম, ওদিনে মিঃ কাউলে হিমালয়ে আমাদের মতই তিনটে চাক মার্কা করে তা থেকে সাড়ে চার হাজার ডাঁস-মৌমাছি ধরে হলদে ফুটকি দিয়ে ছেড়ে দিলেন, সেইমত তার চিঠি এল। আগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে আমি আমাদের মার্কা করা চাক তিনটে আবার দেখতে গেলাম, ওখানে গিয়ে দেখি কোনো চাকেই একটাও মৌমাছি নেই, সব কোথায় যেন চলে গেছে। পর বছর জুন মাসে আবার আমরা সুন্দর বনে আমাদের মার্কা করা চাকগুলো দেখতে গেলাম, ওখানে চাক হয়েছে ঠিকই, আমরা প্রায় ছ'হাজার মৌমাছি আটক করলাম, দেখলাম, একটা মৌমাছির পাখনায় ফুটকি দেওয়া নেই। ডক্টর কাউলের চিঠি পেলাম, তার অবজারভেসানও একই রকম, তিনি একটাও ফুটকি দেওয়া মৌমাছি খুঁজে পান নি।

তাহলে যেখানের রহস্য সেখানেই থেকে গেল, সুন্দর বনে যে সমস্ত ডাঁস-মৌমাছি চাক বাঁধতে আসে, তারা কোথা থেকে আসে আর কোথায় যায়, এবং হিমালয়ের উত্তরে, দার্জিলিংয়ে, বা আসামে যে সমস্ত ডাঁস-মৌমাছিরা (Apis Dorsala) চাক বাঁধে তারা কোথা থেকে আসে আর কোথায় যায়, এই রহস্য যেমন ছিল তেমনি থাকল, এর সমাধান করতে আমাদের যুক্ত প্রচেষ্টা বিফল হল। জানিনা এই রহস্যের সত্য উদ্ঘাটন করতে পারবেন কিনা ভবিষ্যতে কোনো বিজ্ঞানী!

খন্দেশখালি, (সুন্দরবন) 24-পরগণা।

বলতে পারো কেন ?

সুধাংশু পাত্র

গত মাসের প্রশ্ন

"আকাশ কেন নীল ?"

উঃ সূর্যের সাদা আলো সাত রঙের আলোকের সমষ্টি। প্রত্যেক রঙের আলোকের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য আলাদা আলাদা। লালের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সবচেয়ে বেশি। তার পরের রঙের আলোক তরঙ্গ গুলোর দৈর্ঘ্য অল্প অল্প করে কমেছে এবং সবচেয়ে কম তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলোক বেগুনী। বেগুনী অপেক্ষা কিছু বেশি অর্থাৎ বেগুনীর উপরেই নীল আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য।

যখন আলোক তরঙ্গ অত্যন্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোন কণিকার উপর পড়ে তখন কণিকাগুলো ঐ তরঙ্গের আঘাত থেকে শক্তি লাভ করে এবং নিজেরাই আবার আলোকের আকারে তাকে চারদিকে ছড়িয়ে দেয়। এই ঘটনাকে বলা হয় আলোকের বিক্ষেপণ বা সুটারিং অব্ লাইট। আর ঐ বিক্ষেপণ কতটা হবে তা নির্ভর করে আলোকের তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের উপর।

দেখা গেছে, নিম্নতর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট আলোকের বিক্ষেপণ ঘটে কিছুটা বেশি। বেগুনী, নীল প্রভৃতি বর্ণের আলোকের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কম। সূর্য রশ্মি যখন বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে তখন বায়ুমণ্ডলস্থিত ধূলিকণা, জলকণা, বা অপরাপর সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ভাসমান কণা ও অণুতে আপতিত হয় এবং বেগুনী, নীল, আসমানী রঙের আলোক—যাদের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কম তাদেরই বিক্ষেপণ ঘটে। অপরদিকে সূর্য রশ্মিতে বেগুনী অপেক্ষা নীল ও আসমানী রঙের আলো অধিক থাকে এবং চোখও আমাদের বেগুনী অপেক্ষা নীলের প্রতি অধিক সংবেদনশীল। তাই বিক্ষিপ্ত নীল ও আসমানী রঙটাই আমাদের চোখে পড়ে এবং আকাশকে নীল দেখি।

পৃথিবীতে বায়ুমণ্ডল যদি না থাকতো তাহলে আকাশকে নীল দেখাতো না। বিক্ষেপণ হওয়ার কোন সম্ভাবনা থাকতো না এবং আকাশকে কালোই দেখাতো। পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে অনেক উঁচুতে-যেখানে বায়ুকণা নিতান্ত বিরল, সেখান থেকে আকাশকে কালোই দেখায়।

এ মাসের প্রশ্ন

"মানুষ ঘুমানোর সময় স্বপ্ন দেখে কেন ?"

জানতে চেয়েছে (1) অদিতি মিত্র, কোন্নগর-হুগলী ; (2) সুতপা গায়েন ও সুলতা গায়েন বি.টি.পি. এস. টাউনশিপ–ত্রিবেণী–হুগলী ; (3) অনুপম দাস, দাঁতন—মেদিনীপুর।

প্রঃ এইড্‌স্ রোগের কারণ ও প্রতিষেধক কী ? এটি কী কোন ভাইরাস ঘটিত রোগ ? (1) সৈকত পাল, বাগবাজার কলিকাতা-3 ; (2) মানস মণ্ডল ও সুহাস বক্সী, রঘুনাথবাড়ী—মেদিনীপুর ; (3) প্রবীর ধাওয়া, চন্দনা পাড়া—বেনাপুর হাওড়া।

উঃ এইড্‌স্ (AIDS এর পুরো নাম "অ্যাকোয়ার্ড ইমিউন ডেফিসিয়েন্সি সিনড্রোম" এটি ভাইরাস গঠিত রোগ এবং ভাইরাসের নাম হিউম্যানটি-সেল লিম্ফোট্রপিক ভাইরাস-টাইপ থ্রি বা সংক্ষেপে HTLV—3। নামকরণ করেছেন প্রখ্যাত মার্কিন গবেষক রবার্ট সি. গ্যালো, 1984 সালে

গবেষকদের মতে উক্ত ভাইরাসের পোষক আফ্রিকার এক জাতের নীল বানর। আফ্রিকার অধিবাসীরা ঐ বানরদের মাংস খায় এবং তাই স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে রোগটি দীর্ঘকালের। তানজানিয়া, কেনিয়া, উগাণ্ডা, হাইতি প্রভৃতি অঞ্চলে ওর ভয়ানক প্রাদুর্ভাব। কথিত আছে, প্রথম হাইতি থেকে সভ্য জগতে উক্ত রোগকে বহণ করে এনেছেন মার্কিনরা। তারপর সেখান থেকে ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়েছে পৃথিবীর অপরাপর দেশে। তবে আক্রান্তদের মধ্যে মার্কিনরা বেশি, তারপর ফ্রান্স, জার্মানী ও কানাডার অধিবাসীরা। ভারতবর্ষে বিদেশীদের আগমন যেখানে বেশি—সেই মাদ্রাজ ও বোম্বাইতে আক্রান্তদের সংখ্যাও তাই বেশি। কলিকাতায় অপেক্ষাকৃত অনেক কম। তবে শোনা যাচ্ছে, বর্তমানে বেশ দু-চার জনের রক্তে উক্ত ভাইরাসের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে।

উক্তরোগের ভাইরাস ভারি সাংঘাতিক। সাধারণভাবে ভাইরাসে আক্রান্তদের সঙ্গে মেলামেশা ওঠাবসা, এমনকি করমর্দনেও ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এমনও দেখা গেছে, হাসপাতালে ইনজেকসন দেওয়া সূঁচের

মাধ্যমেও এক দেহ থেকে অপর দেহে সংক্রমিত হয়। রোগটির প্রধান প্রধান লক্ষণ (1) পেটের গোলমাল ও পায়খানার সঙ্গে রক্ত পড়া, (2) প্রতি সপ্তাহ অন্তর অন্তর পর্যায়ক্রমে জ্বর আসা ও জ্বর কেটে যাওয়া, (3) শুকনো খুসখুসে কাশি, (4) বগল ও কুঁচকি ফুলে ওঠা, (5) রাত্রে ঘাম ঝরা, (6) মুখ ও দাঁতের উপর কালো কালো দাগ পড়া (9) নখ ও চুলের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি ঘটা ইত্যাদি।

রোগটি ভারি সংক্রামক এবং এই রোগে আক্রান্ত হলে শরীরের সমস্ত প্রতিরোধ ক্ষমতা ধীরে ধীরে হ্রাস পায়, আর রোগীও সহসা মারা যায়। রোগটির প্রকৃত প্রতিষেধক এখনও আবিষ্কৃত হয়নি বলা চলে। AST নামে ওষুধটি বিশেষ ফলপ্রদ বলে মনে করা হয়। তবে প্রাথমিক অবস্থায় ধরা পড়লে আরোগ্যের সম্ভাবনা যথেষ্ট। শোনা যাচ্ছে, আমেরিকায় কর্মরত প্রখ্যাত ভারতীয় জৈব রসায়ন বিজ্ঞানী ডঃ ভৈরব ভট্টাচার্য উক্ত রোগ নির্ণয়ের একটি সহজ উপায় আবিষ্কার করেছেন।

প্রঃ উট জলপান না করে কীভাবে দীর্ঘকাল থাকতে পারে? রামকৃষ্ণ সাউ, নাঙ্গালপুর-হাওড়া।

উঃ। কেবল জল নয়, উটরা বেশ কিছুদিন আহার না করে বা অল্প অল্প আহার করেও কাটিয়ে দিতে পারে। এটি উটের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

উটরা মরুভূমির জীব। আর মরুভূমিতে জল সহজলভ্য নয় বলে সেখানকার জীবদের এবং উদ্ভিদদেরও বেশ কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। ওরা সবাই জল সম্বন্ধে ভয়ানক সচেতন! অপর দিকে দেহের জল যাতে মল, মূত্রে, ঘাম ইত্যাদি বর্জ্য পদার্থের মাধ্যমে বেরিয়ে যেতে না পারে তার জন্য তাদের দেহ ও দেহত্বকের বৈশিষ্ট্যই আলাদা!

উটের দেহত্বকেও তেমনই বৈশিষ্ট্য আছে। পরিবেশের তাপমাত্রা বাড়লে কিংবা কমলে দেহের তাপমাত্রাও বাড়তে কমতে পারে। অর্থাৎ শীত-গ্রীষ্ম কোনটিই তাদের কাবু করতে পারে না, তথা আদৌ অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করে না। দেখা গেছে গরম পড়লে দৈহিক তাপমাত্রাকে উট 12° ফারেনহাইট পর্যন্ত বাড়াতে পারে—যা আমরা কল্পনায়ও স্থান দিতে পারি না।

আগে অনেকের ধারণা ছিল, উট তার কুঁজের মধ্যে জল ধরে রাখে। এটি কিন্তু ঠিক কথা নয়। কুঁজের ভেতরে থাকে চর্বি। একটানা কিছুকাল খাদ্য ও জল গ্রহণ করার পর চর্বি জমতে জমতে ওদের কুঁজটা স্ফীত হয়ে উঠে এবং তখনই মরুভূমির উপর দিয়ে যাতায়াত করার উপযোগী হয়। আর একটানা কয়েকমাস জল আদৌ গ্রহণ না করলেও চলে। সেই সময় ঐ চর্বিই উটের দৈহিক কাজকর্মকে অটুট রাখে।

উটের দেহের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য, দেহের জলীয় অংশের এক চতুর্থাংশের মত খরচ হয়ে গেলেও তাদের দেহের রক্তের আয়তন অতি সামান্যই হ্রাস পায়। এমন কি জলীয় অংশের অর্ধেকটাও যদি খরচ হয়ে যায় তাহলেও ওদের রক্ত জমাট বেঁধে মৃত্যু ডেকে আনে না। অথচ আমাদের দেহের $\frac{1}{5}$ অংশের মত জলীয় পদার্থ খরচ হয়ে গেলেই মৃত্যু অবধারিত।

আরও মজার কথা, পরিবেশে জলের প্রাচুর্য থাকলেও উট যখন তখন জল পানের ইচ্ছা প্রকাশ করে না। কয়েক মাস জল পান না করলে দেহ তাদের শীর্ণ হয়ে যায় এবং এক-কালে প্রায় 100 লিটারের মত জল দেহে চালান করে দেয়। আরও মজার কথা, জলপানের মাত্র কয়েক ঘণ্টা পরেই শীর্ণ উট তার পূর্ব শরীর ফিরে পায়।

প্রঃ। 1. রঙীন কাচ গুঁড়া করলে সাদা দেখায় কেন? সমীকরণ মজুমদার, নজরগঞ্জ, মেদিনীপুর।

2. রঙীন কাচ গুঁড়ো করলে সাদা দেখায় কিন্তু তাতে জল দিলে পুনরায় পূর্বের রঙ ফিরে পায় কেন? আশিস মণ্ডল, পাটুলি স্টেশন বাজার বর্ধমান।

3. কাচ স্বচ্ছ কাচের গুঁড়া অস্বচ্ছ; কিন্তু কাঁচের গুঁড়ায় জল ঢাললে পুনরায় স্বচ্ছ দেখায় কেন? অমর কুণ্ডু, চুড়িপট্টি, জিয়াগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

উঃ। রঙীন কাচ সূর্যালোকের একটি বিশেষ রঙের আলোক রশ্মির প্রতিফলন ঘটায়। যে কাচ যে বর্ণের আলোক রশ্মিকে নিজের ভেতর দিয়ে প্রেরণ করে তাকে সেই রঙেরই দেখায়। ঐ কাচকে গুঁড়ো করে ফেললে সূর্যরশ্মির বিক্ষিপ্ত প্রতিফলন ঘটায় বলেই সাদা দেখায়। কিন্তু চূর্ণ অবস্থায় তাকে জলের ভেতরে রাখলে স্বচ্ছ প্রতিসারক মাধ্যমে পরিণত হয় বলেই তখন পূর্বের মত রঙীন দেখায়।

তেমনি কাচের গুঁড়োতে সূর্যালোকের বিক্ষিপ্ত প্রতিফলন ঘটায় বলে সাদা দেখায় এবং জল দিলে আলোক সাপেক্ষে সমস্ত অংশই স্বচ্ছ মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। ফলে আলোকের প্রতিফলন অথবা প্রতিসরণ ঘটে। আর ঐ কারণেই কাচের গুঁড়োকে জলে রাখলে পুনরায় স্বচ্ছ দেখায়।

প্রঃ। শীত করলে গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠে কেন? ননীগোপাল জানা, নেগুয়া, মেদিনীপুর।

উঃ। গায়ের লোম হেলান দেওয়া অবস্থায় থাকে এবং লোমের গোড়ায় থাকে এক বিশেষ ধরণের পেশী—যা কতকটা বক্রভাবেই থাকে। অত্যধিক শীতে তথা বাইরের ঠাণ্ডায় শরীরের তাপ উচ্চ হওয়ার জন্য শরীর থেকে তাপ বেরিয়ে যায় এবং প্রবেশ করে পরিবেশের বায়ুতে। আর তখনই পেশী হয় সংকুচিত এবং ওর সঙ্গে সংযুক্ত লোমও খাড়া হয়ে উঠে।

ঈশ্বর, ঐশ্বরিক শক্তি, বিশ্বাস-অবিশ্বাস

লেখকের উত্তর

গত এপ্রিল মাসে ('89) বলতে পারো কেন বিভাগে 'পৃথিবীতে ঈশ্বর বা ঐশ্বরিক শক্তি বলতে কী কিছু আছে।' প্রশ্নটির উত্তরে সন্তুষ্ট না হয়ে চিঠি লিখেছেন (1) মানগোবিন্দ দাস, ডহরপুর, নারায়ণগড়, মেদিনীপুর থেকে। (2) তপোবিজয় মুখোপাধ্যায়, নিমগড়িয়া, বীরভূম থেকে ; (3) মোঃ ওমর আহমেদ, সৈদপুর, টাকী উত্তর 24 পরগণা থেকে এবং 4) শেখ ইউনুস ইউসুফ, বাঁকিপুর-মগরাহাট, দঃ 24পরগণা থেকে।

আপনারা সবাই দার্শনিক যুক্তির অবতারণা করেছেন এবং কেউ কেউ বলেছেন এখনও পৃথিবীতে শতকরা 95 ভাগ মানুষ ঈশ্বর বিশ্বাসী। আপনারা আরও বলেছেন, বহু বিজ্ঞানীও ঈশ্বর বিশ্বাসী।

আপনাদের কথা কিন্তু মিথ্যে নয়। কিন্তু আপনারাই বিচার করুন, দার্শনিক তত্ত্বকে কেমন করে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বলে চালাই ? আপনারা নিশ্চয়ই জানেন, বিজ্ঞান বাস্তব, পরীক্ষার দ্বারা লব্ধ সিদ্ধান্তকেই স্বীকার করে এবং আমাদের চারদিকে আপাত দৃষ্টিতে যে সব অলৌকিক ব্যাপার ঘটতে দেখা যায় তাকে বলে প্রাকৃতিক ঘটনাবলী। ঈশ্বর সম্বন্ধে গবেষণা করা হয়েছে, এবং এখনও হচ্ছে। বিজ্ঞান যদি কোনদিন পরীক্ষার মাধ্যমে ঈশ্বরের স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে পারে তাহলে অবশ্যই ঈশ্বরকে স্বীকার করবে। কিন্তু যতদিন প্রমাণ করতে না পারছে ততদিন সে কেমন করে দার্শনিক তত্ত্বকে গুরুত্ব দেবে, বলুন ?

মানগোবিন্দ বাবু আবার জাতপাতের ব্যাপারেও খুঁত ধরেছেন এবং ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিজ্ঞানসম্মত বলে উল্লেখ না করায় সুদীর্ঘ আট পৃষ্ঠাব্যাপী চিঠি লিখেছেন।

দেখুন মানগোবিন্দ বাবু, বিজ্ঞানে মানুষকে মাত্র একটি প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কালো, সাদা, পীত, এমনকি আদিম অরণ্যচারী মানুষও সেই একই প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত। অতএব বৈজ্ঞানিক আলোচনায় কেমন করে জাত-পাতের বালাইকে বহাল রাখি ? একি মানুষ্যত্বের অবমাননা নয় ? ঈশ্বর বিশ্বাসকে গুরুত্ব দিয়ে আপনি ঈশ্বরের ব্যুৎপত্তি গত অর্থ দিয়ে শুরু করেছেন (ঈশ্ + বরচ) দার্শনিক মতবাদগুলি। আমার মনে হয় আপনি ইচ্ছে করেই আরও কিছু তত্ত্বকে সুকৌশলে এড়িয়ে গেছেন। কারণ, ভারতে বৈদিক যুগ থেকেই তিনটি মতবাদ পাশাপাশি চলে আসছে। ঈশ্বর বিশ্বাসী, নিরীশ্বর বাদী ও নাস্তিক। পাতঞ্জল মতে ক্লেশ, জন্ম, কর্ম, বিপাক, আশয় দ্বারা অপরাভূত চৈতন্যই হচ্ছে ঈশ্বর। অতএব বলা যায়, পাতঞ্জল মতে ঈশ্বর কোন এক নির্দিষ্ট সত্তা নয়।

বেদ ও উপনিষদের যুগেও ভারতে রচিত হয়েছে চার্বাক দর্শনের মত নাস্তিক্য দর্শন। পরের দিকে ভগবান বুদ্ধও ঈশ্বরের প্রতি আদৌ গুরুত্ব আরোপ করেন নি। অথচ তাঁকে আমরা ঈশ্বরের অবতার আখ্যা দিয়ে থাকি। বৌদ্ধ দর্শন তাই নাস্তিক্য দর্শন।

ঈশ্বরকে স্বীকার করা হয়েছে সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, বৈশেষিক, পূর্ব ও উত্তর মীমাংসা মতে। তা সত্ত্বেও প্রমাণ অভাবে ঈশ্বর ধারণাকে অসিদ্ধ বলেছে সাংখ্য। "সাংখ্যের ঈশ্বর অসিদ্ধ, যুক্তিগুলির মধ্যে একটি যুক্তি জীব নিত্য ও অবিনাশী, সুতরাং সৃষ্টিকর্তা অসিদ্ধ।"
(**পৌরাণিক অভিধান, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা**—153)।

এবার পাশ্চাত্য দর্শনের দিকে একবার তাকানো যাক। সর্বগামী গ্রীক দর্শন-বিশেষ করে অ্যারিস্তোতলের ঈশ্বর সম্বন্ধীয় মতবাদকে সবাই নির্বিবাদে মেনে নিতে পারেননি। অনেকে বিরোধিতা করেছেন। প্লিনির মত সর্বকালের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক, বিজ্ঞানী ও পণ্ডিত বিশ্বকোষ রচনা করতে গিয়ে অ্যারিস্তোতলীয় দর্শনে কৌতুকরস পরিবেশন করেছিলেন। উল্লেখ করেছেন "ঈশ্বর সব পারেন কিন্তু নিজে আত্মহত্যা করতে পারেন না, কাউকে ইচ্ছে করলে অমর করাতে পারেন না, 10 এর দ্বিগুণ 20-র বেশী কিংবা কম করতে পারেন না"। (বিজ্ঞানের ইতিহাস—ডঃ সমরেন্দ্রনাথ সেন)।

অতএব যুগে যুগে ঈশ্বর সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ গড়ে উঠেছে। তবু বিজ্ঞানকে ধন্যবাদ ঈশ্বরকে প্রতিষ্ঠা করতে না পারলেও মানগোবিন্দ বাবু তর্ক করতে গিয়ে অসাবধানতা বশতঃ যাকে ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করেছেন সেই ধর্মকে (ধৃ + মন্) বাস্তব পরীক্ষালব্ধ সিদ্ধান্তের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করেছেন। 1927 সালে নীলস বোর প্রভৃতি পরমাণু বিজ্ঞানীরা অণু পরমাণুর প্রতিক্রিয়া, ইলেকট্রনের জড়ধর্ম ও শক্তিধর্ম ইত্যাদি পরীক্ষা করে প্রমাণ করেছেন প্রেম, প্রীতি, মৈত্রী, অহিংসা, ক্ষমা তিতিক্ষা প্রভৃতি মানবিক সদগুণাবলীর (ধর্মের ব্যাপক অর্থ) সঙ্গে বিজ্ঞানের কোন বিরোধ নেই। বরং একে অপরের পরিপূরক। **বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ থেকে প্রকাশিত 1965 সালের জ্ঞান বিজ্ঞানের একটি সংখ্যায় মহান ভারতীয় বিজ্ঞানী অধ্যাপক প্রিয়দারঞ্জন রায়ের লেখা প্রবন্ধ**)।

পৃথিবীর মহান ধর্মনেতাদের মতও ঐ একই। তাই না ?

অত্যধিক ভয় বা আনন্দেও অনেক সময় পেশী সঙ্কুচিত হলে অনুরূপ ঘটনা ঘটে।

প্রঃ। সূর্য কী নিজ অক্ষের উপর পাক খায়! বিশ্বজিৎ সরকার, রাজপুর-24 পরগণা।

উঃ। হ্যাঁ, পাক খায়। নিজ মেরু অবলম্বনে সূর্যকেও পশ্চিম থেকে পূর্বে পাক খেতে হচ্ছে এবং পৃথিবীর দিন হিসেবে 26 দিনে সে সম্পন্ন করছে একটি আবর্তন। সূর্যের গায়ে কলঙ্ক রেখাগুলোর উদ্ভব এবং ঐ সৌরকলঙ্কের সূর্য দেহে স্থান পরিবর্তন ও পরিশেষে বিলীন হয়ে যাওয়া, ইত্যাদিকে প্রত্যক্ষ করে বিজ্ঞানীরা অনুরূপ সিদ্ধান্তে এসেছেন।

প্রঃ। পৃথিবীর দীর্ঘতম নদী কোনটি? মিসিসিপি মিসৌরী না আমাজন? মলয় কুমার মিত্র, ঘরগোহাল, হুগলী।

উঃ। দীর্ঘতম নদী মিসিসিপি মিসৌরী। আমাজন নদী চওড়ার দিক থেকে সব চেয়ে বেশী। অর্থাৎ-এর মোহানার কাছে এত চওড়া যে পৃথিবীর কোন নদীর এমন বিস্তার নেই।

বিশিষ্ট বিজ্ঞানলেখক

সমরজিৎ করের

পরমাণু গবেষণায় ভারত

দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হয়েছে

দাম: ১০০০ টাকা

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ,
৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯

শরীর সম্পর্কে কয়েকটি সতর্কতা

1. কোন একটি খাদ্যের ক্রমাগত যেন ঘাটতি না ঘটে।

2. দুধের বিকল্প সয়াবিন বা নারকেলকে অন্তর্ভুক্ত করা চলে। চীনে বাদাম ভেজানো গ্রহণও (20 গ্রামের বেশী নয়) ভাল।

3. চাল ও আটা সমপরিমাণ গ্রহণ করা ভাল এবং মাঝে মাঝে মোটা চালের ভাত।

4. আঙ্গুর, আপেল, কমলা প্রভৃতি সংরক্ষিত ফল অপেক্ষা কমদামী দেশী টাটকা যে কোন ফল উৎকৃষ্ট। তবে এদের 50 গ্রামের বেশী গ্রহণ উচিত নয়।

5. বেশী দামের মাছ ও মাংস অপেক্ষা টাটকা সাধারণ কুচো মাছ বা লোনা মাছ নিকৃষ্ট নয়। বরং উৎকৃষ্ট। এক্ষেত্রে 40-50 গ্রামের বেশী বাঞ্ছনীয় নয়।

6. ভোজ বাড়ীর, বাজারের খাদ্য ও অধিক তেল মসলা যুক্ত খাদ্য স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো নয়।

7. শাক সব্জীর খোসা ছাড়ানো, সেদ্ধ করে জল ফেলে দেওয়া, কাটার পর ধুয়ে আনা খুবই খারাপ।

8. অল্প পরিমাণে রাঙালু, কচু, ওল ইত্যাদি গ্রহণ খুব ভাল। আলু সংরক্ষণ করা হয় বলে পরের দিকে খাদ্য মূল্য অনেক কমে যায়।

9 রঙীন খাদ্য ও পানীয়, ঠাণ্ডা পানীয় স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর।

10. কীটনাশকের দৌরাত্ম্য চারদিকে—তাই দেখে শুনে শাকসব্জী ও খাদ্যশস্য কিনতে হবে। মোটা দেশীয় আমন ধানের চালে কীটনাশকের অবশেষ কম থাকে।

11. উপরের তালিকা অনুযায়ী প্রত্যেকটি দশ বিশ গ্রাম কম বেশী হলে ক্ষতি নেই। কিন্তু খুব বেশী বা খুব কম হওয়া উচিত নয়।

12. মিষ্টি ঘনীভূত শর্করা হলে বেশী খাওয়া ঠিক নয়।

13. মাদক দ্রব্য একেবারে বর্জনীয়।

কিশোর বিজ্ঞান পরিষদ কর্তৃক প্রচারিত

কিশোর বিজ্ঞান পরিষদ

এপ্রিল '88 থেকে মার্চ '89 পর্যন্ত ক্যুইজ কনটেস্ট, আই কিউ টেস্ট প্রভৃতি প্রতিযোগিতার ফলাফল জুন '88 থেকে মে '89 পর্যন্ত প্রতি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। পুজো সংখ্যায় প্রকাশিত সুপার ক্যুইজ কনটেস্ট ও সুপার আই কিউ টেস্ট প্রতিযোগিতার ফলাফল ঘোষিত হয়েছে ডিসেম্বর '88 সংখ্যায়। এবার তা হবে ডিসেম্বর '89 সংখ্যায়।

গত এক বছরে বিভিন্ন প্রতি-যোগিতায় সফল প্রতিযোগীদের কাছে পুরস্কার ও উপহারের কুপন পাঠানো হয়েছে। (এই বিষয়ে গত মে '89 সংখ্যায় বিস্তারিত ভাবে জানানো হয়েছে) যারা এখনও চিঠিসহ কুপন পাওনি বা চিঠি পেয়ে পুরস্কার পাওনি তাদের অবিলম্বে দপ্তরে যোগাযোগ করতে বলা হচ্ছে। 'বুদ্ধিশুদ্ধি' প্রতি-যোগিতায় সফল প্রতিযোগীদের গত জানুয়ারি '88 থেকে পত্রিকা পাঠানো হচ্ছে।

এবার থেকে প্রতি মাসেই বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় সফল প্রতিযোগীদের উপহার ও পুরস্কারের কুপন বাড়ির ঠিকানায় পাঠানো হবে এবং প্রাপকদের দপ্তর থেকে পুরস্কার ও উপহার গ্রহণ করতে হবে। নাম প্রকাশের 10 দিনের মধ্যে যোগাযোগ না করলে প্রাপকদের সাধারণ ডাকে পুরস্কার ও উপহার পাঠানো হবে। যারা রেজিস্টার্ড ডাকে পেতে ইচ্ছুক তাদের আলাদা ডাক ব্যয় বহন করতে হবে। —পরিচালক

সফল উত্তরদাতাদের নাম

জুন '89-এ প্রকাশিত আই-কিউ-টেস্ট-এর সবকটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়ে (আগে আসার ভিত্তিতে) যারা সার্টিফিকেট পাবে :

1. **শিবানী ভৌমিক,** প্রযত্নে, পি কে. ভৌমিক, 146/A, কাইজার স্ট্রীট (রেলওয়ে কোয়ার্টার), কলকাতা-700 009। 2. **শুভাশিষ বিশ্বাস,** বগুলা কলেজ পাড়া, পোস্ট-বগুলা, জেলা-নদীয়া, পিন-741 502। 3. **লিপি চ্যাটার্জী,** 176/4, শিবপুর রোড, হাওড়া-711 102। 4. **সৌমেন চ্যাটার্জী,** 176/4, শিবপুর রোড, হাওড়া-711 102। 5. **অভিজিত খাঁড়া,** প্রযত্নে, শশধর খাঁড়া, গ্রাম-বাসুদেবপুর, পোস্ট-রামনগর, জেলা-হাওড়া, পিন-711 312।

জুন '89-এ প্রকাশিত ক্যুইজ কনটেস্ট গ্রেড-I-এর সর্বাধিক প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়ে (আগে আসার ভিত্তিতে) যে তিনজন পুরস্কার পাবে :

1. **পার্থপ্রতিম মজুমদার** (দশটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর), গ্রাম+পোস্ট-রামনগর, জেলা-হাওড়া, পিন-711 312। 2. **সোনালী রায়**—(দশটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর), প্রযত্নে, সুবীর কুমার রায়, ইন্দা (টায়ার হাউসের নিকট), পোস্ট-খড়্গপুর, জেলা-মেদিনীপুর, পিন-721 305।

3 **পার্থ দাস**—(নয়টি প্রশ্নের সঠিক উত্তর), 6/G, নলিন সরকার স্ট্রীট, কলকাতা-700 004।

জুন '89-এ প্রকাশিত ক্যুইজ কনটেস্ট গ্রেড-I-এর নয়টি প্রশ্নের সঠিক উত্তর আরও যারা দিতে পেরেছে :

24-পরগণা : সঞ্জয় কর্মকার; **হুগলী :** পার্থশেঠ, ইন্দ্রজিৎ দত্ত; **বীরভূম :** উৎপল চ্যাটার্জী; **বাঁকুড়া :** পত্রলেখা মুখার্জী।

জুন '89-এ প্রকাশিত ক্যুইজ কনটেস্ট গ্রেড-II এর দশটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়ে (আগে আসার ভিত্তিতে) যারা পুরস্কার পাবে :

1. **সঞ্জয় বাহেতী**—প্রযত্নে, ডি. জি. বাহেতী, হাত্তালা, রামপুরহাট, জেলা-বীরভূম। 2. **ধীমান বসু**—38/1, রাজা রামমোহন রায় রোড, কলকাতা-700 008। 3. **পিনাকী দত্ত,** 47, বড়জোনপুর, কাঁচরাপাড়া, 24-পরগনা (উঃ)।

জুন '89-এ প্রকাশিত ক্যুইজ কনটেস্ট গ্রেড-II-এর দশটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর আরও একজন দিতে পেরেছে :

কলকাতা : অর্কপ্রতিম দাশ।

জুন '89-এ প্রকাশিত ক্যুইজ কনটেস্ট গ্রেড-III-এর সর্বাধিক প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়ে (আগে আসার ভিত্তিতে) যারা পুরস্কার পাবে :

1, **রুনু নিয়োগী :** (আটটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর) প্রযত্নে, রবীন্দ্রনাথ নিয়োগী, গ্রাম-পানপুর, পোস্ট-নারায়ণপুর, জেলা-উঃ 24-পরগনা, পিন-743 126 2. **রাজা দত্ত,** (সাতটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর) 5/1, ঠাকুর রাধাকান্ত লেন, বাগ-বাজার, কলকাতা-700 003, 3. **সুধাংশু ঘোষ** (সাতটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর), A3-4/2, ভি. কে. নগর, দুর্গাপুর, জেলা-বর্ধমান, পিন-713 210।

সায়েন্স এক্সপেরিমেণ্টস্

রসায়নের ভেল্কি

শুভ্রকান্তি নন্দ ও সৌম্যকান্তি নন্দ

একটা মজাদার বিজ্ঞানের খেলার কথা বলি। তোমরা কিন্তু এটা নিজেই করবে। এই মজার খেলার জন্য চাই তিনটি জিনিষ।

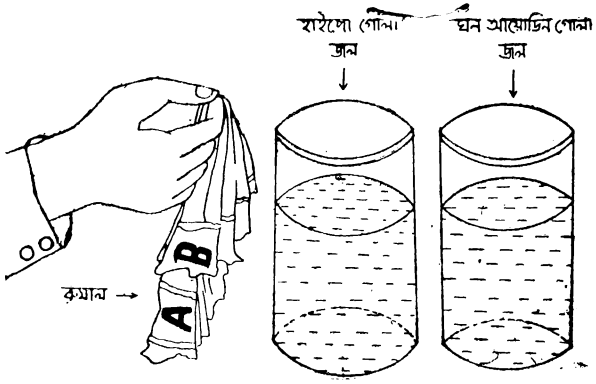

(i) ঘন আয়োডিন গোলা জল।

(ii) হাইপো গোলা জল (বেশী ঘন নয়)।

(iii) চকলেট রঙ (এই রঙ যেন আয়োডিনের মত হয়)।

প্রথমে একটা সাদা রুমালে নিজের ইচ্ছামত চকলেট রঙ দিয়ে কিছু লিখবে তারপর ভালো করে রঙ শুকিয়ে যাবার পর ঘন আয়োডিন গোলা জলে রুমালটাকে ডুবিয়ে নেবে। এখন কিন্তু দেখবে যে আয়োডিন গোলা জলে ডুবিয়ে মেওয়ার পর লেখাটা দেখা যাচ্ছে না। এর পর কিছুক্ষণ শুকিয়ে নেবে। এর পর এক গ্লাস হাইপো গোলা জলে রুমালটাকে ডুবিয়ে নিলেই আয়োডিনের দাগ চলে যাবে, তর্থাৎ আয়োডিনের রঙ উঠে যাবে। আর চকলেট রঙ দিয়ে লেখাটি ফুটে বেরুবে। হাইপোর বিশেষগুণের জন্যই এমন ঘটলো। বুঝলে? ছবিটা দেখে এবার নিজেরাই চেষ্টা কর।

এগরা, মেদিনীপুর।

মডেল নির্মাতাদের প্রতি

মডেল নির্মাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে—এবার থেকে তাঁরা যেন রচনার শেষে অবশ্যই স্বীকৃতি হিসেবে নিম্নোক্ত ঘোষণাটি করেন ঃ

ঘোষণা

আমি (পুরো নাম ও ঠিকানা) .....

নিজে এই মডেলটি, আমার রচনা ও সার্কিট ডায়াগ্রাম অনুযায়ী তৈরি করে সাফল্য অর্জন করেছি।

স্বাক্ষর.....

ক্যুইজ কনটেস্ট
গ্রেড—I II III-এর উপহার

সবকটি প্রশ্ন বা সর্বাধিক প্রশ্নের সঠিক উত্তর দানের ভিত্তিতে (আগে আসার ভিত্তিতে) প্রথম তিনজনকে পুরস্কৃত করা হবে। তিনজনেরই পুরস্কারের মূল্যমান সমান।

আই-কিউ-টেস্টের সফল উত্তর-দাতাদের আগে আসার ভিত্তিতে 10টি সার্টিফিকেট দেওয়া হবে।

আগস্ট '89 সংখ্যার
ক্যুইজ কনটেস্টের উপহার

গ্রেড-1 **সমরজিৎ করের**
পরমাণু গবেষায় ভারত

গ্রেড-2 **অমরনাথ রায়ের**
আরও সায়েন্স ক্যুইজ

গ্রেড-3 **পার্থ চক্রবর্তীর**
বুদ্ধি নিয়ে খেলা

প্রতিযোগিতার কুপন

ক্যুইজ কনটেস্ট—1/2/3 এবং আই কিউ টেস্টে উত্তরের সঙ্গে এই কুপনটি কেটে পাঠাতে হবে।

আমি.....

.....

বাড়ির ঠিকানা.....

.....

বয়স..... শ্রেণী .....

বিদ্যালয়ের নাম .....

.....

আই কিউ টেস্ট / ক্যুইজ কনটেস্ট গ্রেড

অডিও অ্যামপ্লিফায়ার

শ্যামাপদ পাণ্ডে

একটা নতুন ধরনের মডেলের কথা বলছি। কিভাবে একটি IC ব্যবহার করে রেডিও অ্যামপ্লিফায়ার, টেপ-প্লেয়ার, অ্যামপ্লিফায়ার, এবং টিভির শব্দাংশ তৈরি করা সম্ভব।

শ্রীদেবজ্যোতি সাধু মহাশয়-এর অনুরোধে "নিজে নিজে কর" বিভাগে "অডিও অ্যামপ্লিফায়ার" IC দিয়ে তৈরী সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করতে সক্ষম হয়েছি।

লক্ষ্য করুন দুটি সার্কিট দেখানো হয়েছে। আর এই দুই সার্কিটের মধ্যে তফাৎ সামান্য। যেমন Fig-2 চিত্রে 138 নম্বর টার্মিনালের সঙ্গে কনডেন্সার জুড়ে দেওয়া হয়েছে। এর ফলে দ্বিতীয় সার্কিটের গেইন প্রথমটির তুলনায় অনেক গুণ বেশী। গেইনের এই পার্থক্য বুঝবার জন্য প্রথমে Fig-1 চিত্রের সার্কিটটি তৈরি করে নিন। পরে এই একই অবস্থায় কনডেনসার লাগিয়ে দেখুন, কত বেশী হয়েছে, বস্তুতঃ পক্ষে দ্বিতীয় সার্কিটের গেইন এত বেশী হবে যে R_2-এর মাপ পরিবর্তন করে গ্রহণযোগ্য শব্দ ঠিক করা।

Fig 1

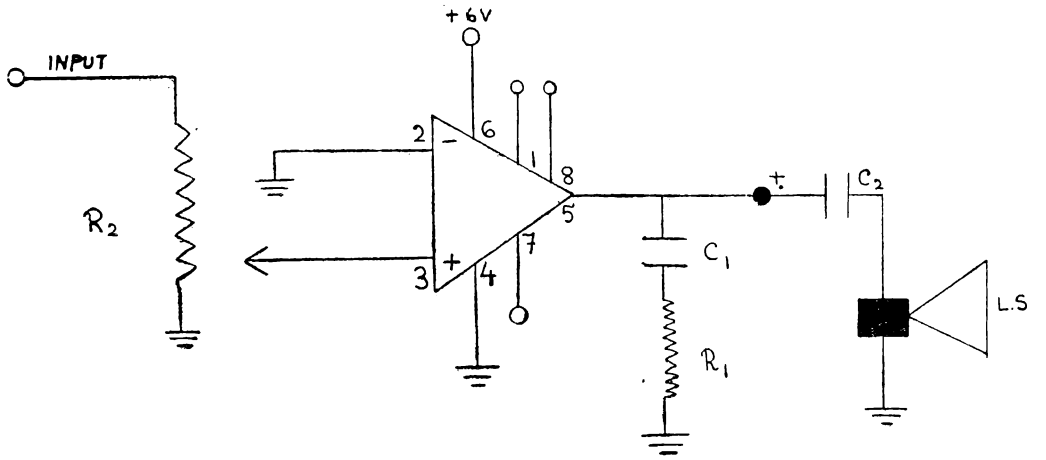

প্রয়োজনীয় উপকরণ ঃ

1. আই সি (IC) LM 386
2. R_1—10Ω, R_2—10K প্রোটেনসিওমিটার।
3. C_1—0·05μE, C_2—250μF, C_3—10μF
4. LS—8Ω লাউড স্পিকার
5. 6v. ব্যাটারি, তার, সলডার।

সতর্কতা ঃ

IC-এর প্রসঙ্গে কিছু কথা বলা দরকার, IC লাগানোর সময় বিদ্যুৎ সুইচ বন্ধ করে ঝালাই করতে হবে। আবার লক্ষ্য রাখতে হবে 9-10 সেকেণ্ডের বেশী IC-এ পা গরম পা না হয়, এক্ষেত্রে 10 ওয়াট-এর Iron ব্যবহার করা ভাল।

Fig 2

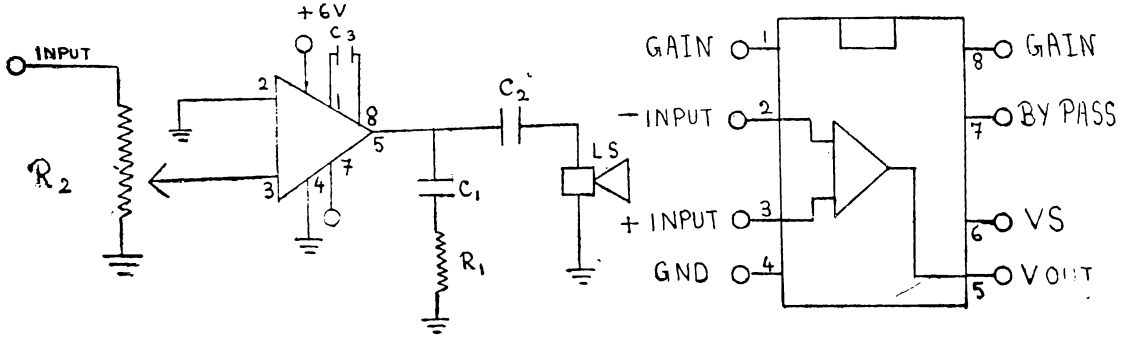

[illegible], [illegible]পুরা, মেদিনীপুর।

ফিঙার কম্পিউটার

গিরিশ রায় বর্মন

চার্লস্ ব্যাবেজ নামে এক ইংরেজ গণিতজ্ঞ 1831 খ্রীষ্টাব্দে এ্যানালাইটি-ক্যাল নামে এক ধরণের হস্তচালিত কম্পিউটার যন্ত্রের প্রবর্তন করেন। এই কম্পিউটারের সাহায্যে ক্যালকুলেটারের মত বড় বড় যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ ইত্যাদি অঙ্ক অতি অল্প সময়ে করতেন। 1880 খ্রীষ্টাব্দে ডঃ হার্মান হেলবিথ কম্পিউটারে পাঞ্চ কার্ডের মাধ্যমে কিছু প্রোগ্রাম ধরে রাখার ব্যবস্থা করেন।

হার্বাড মার্ক-1 নামে এক বৈজ্ঞানিক বৈদ্যুতিক রিলের মাধ্যমে হস্তচালিত কম্পিউটারকে স্বনিয়ন্ত্রিত করে তোলেন। 1946 থেকে স্বনিয়ন্ত্রিত বৈদ্যুতিক কম্পিউটারের জয়যাত্রা শুরু হয়। এখন ডাটা বা মাইক্রো প্রসেসারের যুগ। এই যুগে ডাটা বা ডিজিটাল কম্পিউটার কি ভাবে কাজ করছে? সে কথাই আজ ফিঙার কম্পিউটারের মাধ্যমে বলব।

ডাটা বা ডিজিটাল কম্পিউটারের জয়যাত্রা শুধু শূন্য ও এক এই দুটি সংখ্যাকে নিয়ে যাকে বাইয়োনারী পদ্ধতি বলা হয়। এই বায়োনারী পদ্ধতির 0, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 ইত্যাদি নির্দিষ্ট কতকগুলি সংখ্যাকে নিয়ে কারবার। মনে কর, ডান হাতের পাঁচটি আঙুলকে নিয়ে তোমার **ডান হাতটি একটি ফিঙার কম্পিউটার**। অঙ্গুষ্ঠ (বুড়ো আঙ্গুল) তর্জনী, মধ্যমিকা, অনামিকা, কনিষ্ঠা আঙ্গুল গুলি এক একটি পাঞ্চ কার্ড। যার মধ্যে অঙ্গুষ্ঠের 0, তর্জনীর —1, মধ্যমার—2, অনামিকার—4, কনিষ্ঠার—8 মান সংখ্যা ধরে রাখা আছে।

এবার অঙ্গুষ্ঠকে নীচু. তর্জনীকে উপরে, মধ্যমাকে নীচু, অনামিকাকে উপরে, কনিষ্ঠাকে নীচু করে ধরে রাখ এবং বাইয়োনারী পদ্ধতির হিসাব অনুসারে উপরে ধরে রাখা আঙ্গুলগুলিকে এবং নীচু করে ধরে রাখা আঙ্গুল গুলিকে ডানদিক থেকে 0 ধর তবে 01010 হবে। এক ডিজিটকে মনে কর সুইচের অন এবং শূন্য ডিজিটকে মনে কর সুইচের অফ পজিসন। এই অনুসারে আঙ্গুলে ধরে রাখা মানগুলি যোগ করলে 0+4+0+1+0=5 হবে। অনুরূপ পাঁচটি আঙ্গুলকেই যদি উপরে ধরে রাখ তাহলে 8+4+2+1+0 =15 হবে। আশা করি 0 থেকে 15 এর মধ্যে যে কোন সংখ্যা এখন ফিঙার কম্পিউটারে তুমি হিসাব করতে পারবে।

এই বাইয়োনারী ডিজিট শূন্য ও এক কে ডিজিটাল কম্পিউটারে ট্রানজিস্টর সুইচ ও সার্কিটের মাধ্যমে পরিচালনা করা হয়। এই সুইচিং সার্কিট গুলি প্রধানতঃ য়্যাণ্ডগেট, অর গেট, নর গেট নামে পরিচিত।

দঃ পূঃ রেলওয়ে, খড়্গপুর, মেদিনীপুর।

বিজ্ঞান সংবাদ

বিজ্ঞানের নিয়ম কানুন

শিরোনামে আকাশবানীতে ধারাবাহিক অনুষ্ঠান ভারত সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা দপ্তরের সহযোগিতায় আকাশবানী কর্তৃপক্ষ একটি অভিনব বিজ্ঞান অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন। ছোটদের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা বিষয়ে আগ্রহী করে তোলাই এই অনুষ্ঠানের প্রধান উদ্দেশ্য। মোট 13টি পর্যায়ে কলকাতা, আগরতলা, শিলিগুড়ি ও শিলচর কেন্দ্র থেকে বাংলায় আকাশবানী এই অনুষ্ঠান প্রচার করবেন।

মুর্শিদাবাদে বিশ্ব পরিবেশ দিবস

কাতলামারী সি. ভি. রমন সায়েন্স ক্লাবের উদ্যোগে মুর্শিদাবাদ জিলা বিজ্ঞান পরিষদ এবারে 4ঠা ও 5ই জুন কাতলামারী বালিকা বিদ্যালয়ে বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদ্‌যাপন করে। বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করার জন্য ছাত্র ছাত্রীদের জন্য কুইজ, বসে আঁকো, বিজ্ঞান মডেল প্রতিযোগিতা এবং সর্বসাধারণের জন্য বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

বৃক্ষরোপন করে পরিবেশ উৎসবের সূচনা করেন জেলা সমাহর্তা দেবাদিত্য চক্রবর্তী। আলোচনা চক্রে অংশ নেন অধ্যাপক ডঃ আশিষ চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক ডঃ পার্থসখা বসু, শ্রীমতি ইন্দ্রিতা গুপ্ত, অধ্যাপক সৌমেন গুপ্ত প্রমুখ। এছাড়া পোস্টার প্রদর্শনী, কুসংস্কার বিরোধী অনুষ্ঠান অগণিত গ্রামবাসীর দৃষ্টি আকর্ষন করে।

গ্রামে বিজ্ঞান প্রদর্শনী

মেদিনীপুর জেলার ধূলিয়াপুর পল্লীশ্রী বানীমন্দিরের সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে 21শে এপ্রিল থেকে 25শে এপ্রিল '89 স্কুল কর্তৃপক্ষ বিজ্ঞান প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন এবং বিজ্ঞান প্রদর্শনীর সমস্ত ভার মেছেদার 'আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় সায়েন্স সেন্টারের' উপর দেওয়া হয়েছিল। বিজ্ঞানকে জনমুখী করার প্রতিজ্ঞা বদ্ধ সেন্টারের সদস্যরা পাঁচদিন অক্লান্ত পরিশ্রম করে প্রদর্শনীকে সফল করে। পাম্পাল ব্যালেন্স, থার্মাল পাওয়ার, সিস্‌মোগ্রাফ, কম পয়সার রেফ্রিজারেটর প্রভৃতি মডেল গ্রামের লোকেদের যথেষ্ট মনোযোগ আকর্ষণ করে। বিশিষ্ট অতিথিরা প্রদর্শনীর ভূয়সী প্রসংশা করেন। এই উপলক্ষে সেন্টারের সদস্যরা প্রকাশ্য মঞ্চের উপর হাজার খানেক দর্শকের সামনে "অলৌকিক নয় বিজ্ঞান" শীর্ষক একটি অনুষ্ঠান প্রদর্শন করে; মেছেদার 'আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় সায়েন্স সেন্টার' কিশোর বিজ্ঞান পরিষদের উৎসাহে গঠিত।

—প্রবাল দাস

জ্ঞান ও আনন্দের আশ্চর্য সমীকরণ

শারদীয়

কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান

পুজোর ছুটি ফুরিয়ে গেলেও যে বইয়ের প্রয়োজন ফুরোয় না।

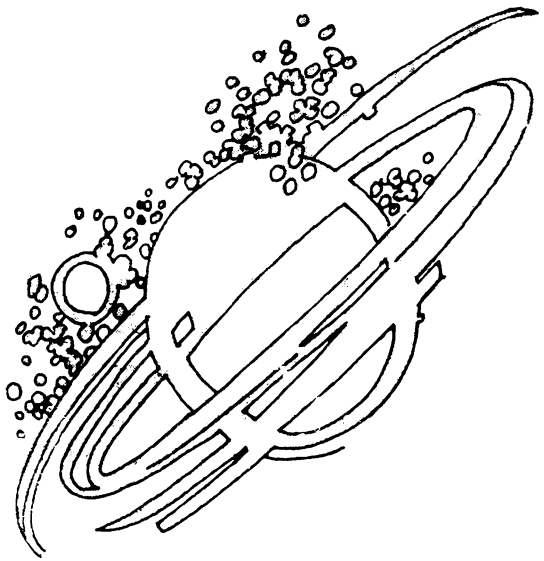

পুজো সংখ্যায় নির্বাচিত

প্রবন্ধগুচ্ছ : বিপন্ন প্রাণিজগত

লিখবেন : নারায়ণ সান্যাল ॥ রতনলাল ব্রহ্মচারী ॥ অজয় হোম ॥ তারক মোহন দাস ॥ সুবীর দত্ত ও অনেকে

বিশ্বখ্যাত লেখকের দুটি সায়েন্স ফিকশান অনুবাদ করবেন

এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায় ও সৌরেণ ভট্টাচার্য

দশটি দুর্দ্ধর্ষ মজার এক্সপেরিমেন্ট উপহার দেবেন

সন্তোষ মিত্র ॥ সমীর কুমার ঘোষ ॥ অপরাজিত বসু ॥ অমরনাথ রায় ॥ দিবাকর সেন ও আরও অনেকে

দিলীপ দাস ও গৌতম কর্মকারের দীর্ঘ চিত্র কাহিনীর সঙ্গে থাকছে—রেবতীভূষণ ও শৈল চক্রবর্ত্তীর কার্টুন

এছাড়া, সুপার ক্যুইজ, আই কিউ টেস্ট, বুদ্ধিশুদ্ধি প্রতিযোগিতা তো থাকছেই—সেই সঙ্গে থাকছে অসংখ্য পুরস্কার।

প্রস্তুতি শুরু হয়েছে

বেরুবে পুজোর আগেই

R/NO 37390/81 KISHORE JNAN BIJNAN Regd. No. WBEC 316 August '89 9th yr VOL 5

পৃথিবী সৌরজগৎ ও ব্রহ্মাণ্ডের অজানা রোমাঞ্চকর অধ্যায়

রাতের আকাশে উজ্জ্বল আলোর চলাফেরা মানুষকে বরাবরই আকৃষ্ট করেছে। কিন্তু দূরবীণের আবিষ্কারের ফলে আমরা সৌরমন্ডলীর গ্রহগুলির অজানা তথ্য সব জানতে পেরেছি। জেনেছি নক্ষত্রের পরিচয়—ধীরে ধীরে চিনতে শিখেছি সপ্তর্ষি ও কালপুরুষকে। যে ভূখণ্ডে দাঁড়িয়ে আমরা অবাক বিস্ময়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকি—সেই ভূখণ্ডই তো সৌরমন্ডলীর একটি গ্রহ—অর্থাৎ আমাদের এই পৃথিবী। কিন্তু কি করে সৃষ্টি হল আমাদের এই পৃথিবীর ? চন্দ্র সূর্য, নক্ষত্ররাজির সৃষ্টি রহস্যের সব কথাই কি আজ আমরা জানতে পেরেছি ?

গত দু দশক ধরে সৃষ্টি রহস্যের যে চাঞ্চল্যকর তথ্য আমরা জানতে পেরেছি তারই সমাবেশ ঘটেছে সম্প্রতি প্রকাশিত তিনটি গ্রন্থে

দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
পৃথিবী পরিচয় ১০৲

বিমান বসু
গ্রহ পরিচয় ১৫৲
নক্ষত্র পরিচয় ১০৲

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ
৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৯